ধর্ম ও দর্শন

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ
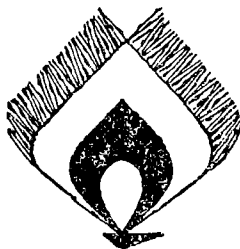
ভাষা-শহীদ
গ্রন্থমালা

অমর একুশে বাংলা একাডেমীর নিবেদন : ১৯৮৬

বাংলা একাডেমী ঢাকা

ভাষা-শহীদ গ্রন্থমালা

প্রথম প্রকাশ : ৫ পৌষ ১৩৯২ ॥ ২১ ডিসেম্বর ১৯৮৫

বা/এ ॥ ১৭৩৪

পাণ্ডুলিপি : সংকলন উপবিভাগ

প্রকাশক : শামসুজ্জামান খান পরিচালক গবেষণা সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা : কাইয়ুম চৌধুরী

মুদ্রক : ওবায়দুল ইসলাম ব্যবস্থাপক বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা

মূল্য : পনেরো টাকা মাত্র ॥ বিদেশে : দেড় মার্কিন ডলার

BHASHA-SHAHEED GRANTHAMALA : Series in honour of the martyrs of the Language Movement of February 1952.

DHARMA O DARSHAN [Religion and Philosophy] by Dewan Muhammed Azraf. Published by Bangla Academy, Dhaka. Bangladesh : 5 Poush 1392/21 December 1985. Price : Taka 15·00 only; Outside Bangladesh US Dollar 1·50 only

Tribute in February 1986 to the Martyrs of February 1952
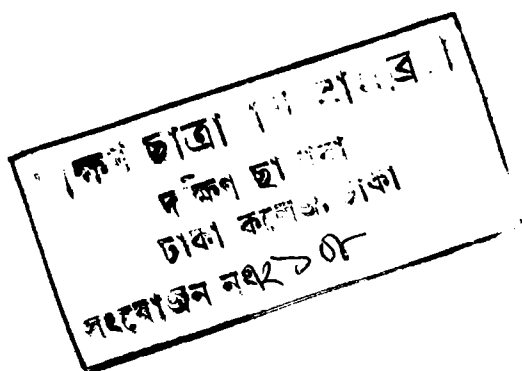
উৎসর্গ

ধর্ম ও দর্শন এ উভয়বিদ বিষয়ে যাঁরা অনুসন্ধিৎসু
তাঁদের হাতে

প্রসঙ্গ-কথা

বাহান্নোর ভাষা-শহীদেরা মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর দেখতে চেয়েছিলেন, সর্বস্তরে সর্বক্ষেত্রে তার প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন। জ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় অবাধ বিচরণ আজো স্বপ্ন। এ স্বপ্নকে খানিক-টুকু হলেও সত্য ক'রে তোলার এক বিনীত চেষ্টা থেকে এ গ্রন্থমালা।

বাংলা একাডেমী সকলের একাডেমী। সবারই দাবি এর উপর। এ গ্রন্থমালার বই তাই সবার জন্যে। কেবল বিশেষজ্ঞের জন্যে নয়, কেবল শিক্ষার্থীর জন্যে নয়। নানা বিষয় নিয়ে এ গ্রন্থমালা -- জ্ঞানের সব দিগন্তই যেন একদিন ছুঁতে পারি, এই আমাদের প্রার্থনা। যাঁরা লিখেছেন তাঁদের অনেকেই এই প্রথম বারের মতো লিখলেন কিংবা এই প্রথম বারের মতো বাংলায় লিখলেন। আমাদের চিন্তার ভুবনে নতুন কণ্ঠ বড়ো প্রয়োজন।

পৃথিবী নিয়ে, জীবন নিয়ে ভাবনা মানুষের বহু দিনের। দেখা দিয়েছে নানা ধর্ম। উদ্ভূত হয়েছে নানা দর্শন। ধর্মের সঙ্গে দর্শনের সম্পর্ক নিয়ে এ বই।

এ গ্রন্থমালার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল সহকর্মী ও অন্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

ভাষা-শহীদদের বারবার শ্রদ্ধা জানাই।

মনজুরে মওলা
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী

মানব-জীবনের বৈশিষ্ট্য

মানব-জীবনের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করলে যা আমাদের কাছে স্পষ্টত প্রতিভাত হয়—তা হচ্ছে মানবেতর প্রাণীর জীবন থেকে তার পার্থক্য। যে সব প্রশ্ন অন্যান্য প্রাণীর জীবনে দেখা দেয় না, মানব-জীবনে তা অতি শৈশবেই দেখা দেয়। জীবন-প্রভাতেই মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে: আমি কোথা থেকে এলাম? কোথায় ছিলো আমার পূর্বের বাসস্থান? কোথায়ই বা আমি ফিরে যাবো? আমার চারদিকে যে সব বস্তু রয়েছে ওরা আমার শত্রু না মিত্র? আমার সম্মুখে যে সব লোক মৃত্যুমুখে পতিত হলো ওরা কোথায় গেলো? তারা আবার আমাদের কাছে ফিরে আসবে—না আসবে না?

বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ কাজকর্মে লিপ্ত থাকার ফলে এ সকল প্রশ্ন সাময়িকভাবে ধামাচাপা পড়ে। খেলাধূলায় রত শিশুরা কৈশোরে বা যৌবনে নানাবিধ জৈবিক সমস্যার সম্মুখীন হয়। কি করে খেতে পরতে পারবে, কি করে অন্য দশজনের মতো বাঁচতে পারবে বা আরো উন্নততর জীবন যাপন করবে—ইত্যাকার প্রশ্ন দ্বারা মানব-জীবন বিব্রত হয়। যৌবনে সে-সব চিন্তাভাবনাই তার জীবনে তীব্রভাবে দেখা

দেয়। এ পর্যায়ে যৌন-আবেগ ও বিপরীত লিঙ্গের নর অথবা নারীর সঙ্গে মিলনের বাসনা মানুষের মধ্যে দেখা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ভোগ-বিলাসের বাসনাও দেখা দেয়। সামাজিক নীতি পালন করে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলে—অর্থলাভের বাসনা আরো তীব্রভাবে প্রবল হয়ে পড়ে। সন্তানলাভের পরে সন্তান-সন্ততির পিতামাতা কেবল তাদের নিজেদের জন্য এসব কামনা করে না, তাদের সন্তানদের জন্যে নানাবিধ বিষয় কামনা করে এভাবে জীবন-স্রোতে ভেসে চললেও মানুষের মনে সেসব আদিম বিষয়ের চিন্তা সম্পূর্ণভাবে বিলীন হয় না। নীরবে-নিভৃতে যখনই মানুষ একটুখানি অবসর পায় তখন ক্ষণিকের তরে হলেও—এ সকল চিন্তা তার মানসে পুনরায় দেখা দেয়। পঞ্চাশোর্ধ্বে তাদের মানসে শৈশবের সে প্রশ্নগুলো আরো তীব্রতর হয়ে দেখা দেয়। এ জীবন যে অনিত্য, এ জীবন যে ক্ষণস্থায়ী, সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহেরই অবকাশ থাকে না। মানুষ আবার সে আদিম প্রশ্নগুলোর মীমাংসা চায়। কেউ বা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে, কেউ বা পড়াশুনার মাধ্যমে—আবার কেউবা তাদের পূর্ববর্তীদের সিদ্ধান্ত থেকে সেগুলোর মীমাংসা চায়। আবার কেউবা সেগুলোকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে, নতুনভাবে তার নিজস্ব মতবাদ প্রচার করতে প্রস্তুত হয়।

একে মানব-জীবনের একটা সাধারণ ধারা বলেই গ্রহণ করতে হয়। তবে এ জগতে এমন মানুষও রয়েছে যাদের জীবনে এসব প্রশ্নের বিশেষ মূল্য নেই। তারা এখনও বল্লম দিয়ে শিকার করে, সে শিকার-লব্ধ জীবের মাংস আহার করে। মৃত্যু কেন হচ্ছে বা মৃত্যুর পরে

মৃত ব্যক্তির স্থান কোথায় হবে সে সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা থাকলেও, জীবন-সংগ্রামে সর্বদা অত্যন্ত ব্যস্ত থাকার ফলে—সে সব প্রশ্নের মীমাংসার জন্যে তারা লিপ্ত হয় না। তবে এ সম্বন্ধে তাদের প্রশ্ন করলে তারা যেন হকচকিয়ে চায়। তারাও বুঝতে পারে যে প্রশ্নগুলো সঙ্গত-ভাবেই করা হয়। এতে স্পষ্টই বুঝা যায়, তাদের মনের অবচেতন স্তরে এ সকল প্রশ্ন রয়েছে। তবে তাদের জীবনে অতিরিক্ত ব্যস্ততার দরুন তারা এগুলোর মীমাংসায় প্রবৃত্ত হয় না।

পূর্বোক্ত প্রশ্নগুলো থেকেই মানব-জীবনে ধর্ম ও দর্শনের উৎপত্তি হয়। এ প্রশ্নগুলোকে আরো বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে ধর্ম ও দর্শনের স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা অবহিত হতে পারি।

তবে এ প্রসঙ্গে আমাদের আরো নানাবিধ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। মানুষ তার কোন্ প্রবৃত্তির তাড়নায় এ সকল প্রশ্নের মীমাংসায় অগ্রসর হয়, তাও আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে পড়ে। আমাদের দেখতে হবে এ সকল প্রশ্ন মানব-জীবনের সঙ্গে জড়িত ভয়-ভীতি বা আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি থেকে দেখা দেয়।

এ সকল প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত আরো নানাবিধ সমস্যা রয়েছে। মানবজীবনের সঙ্গে তত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত না হলেও তাদের ক্রিয়াশী-লতা মানব-জীবনে বিদ্যমান। এ বিশ্বের আদিরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্যে বাসনা মানুষের মনে যদি থাকে তা হলে তার স্বরূপ সম্বন্ধে

জ্ঞানলাভের পদ্ধতিও মানুষের পক্ষে জানা কর্তব্য হয়ে পড়ে। তেমনি তার নিজের সম্বন্ধে এবং তার জ্ঞানের মাধ্যম ও সীমা সম্বন্ধেও সে বাধ্য হয়ে জ্ঞানলাভ করতে চায়। তেমনি তার জীবনের কোনো স্তরে যে ভালো ও মন্দ, সৎ ও অসৎ, মনোহর ও কুৎসিত বলে যে ভেদাভেদ করে—সেগুলোকে পরীক্ষা ও নিরীক্ষা করে দেখা তার পক্ষে কর্তব্য হয়ে পড়ে।

মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধে যতই জয়ী হচ্ছে ততই তার মানসে স্বনির্ভরতা বা স্বাধীনতার অহঙ্কার দেখা দিচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে তার এ অহমবোধ সত্যিকার কিনা—সে সম্বন্ধে আলোচনাও এ প্রসঙ্গের সঙ্গে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

এতে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে মানবজীবনের সঙ্গে জড়িত সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্যেই এ জগতে ধর্ম ও দর্শনের উৎপত্তি।

মানুষের আদি প্রবৃত্তি

মানুষের আদি প্রবৃত্তির স্বরূপ নিয়ে সুদূর অতীতে কোনো প্রশ্ন ওঠে নি। মানুষের মধ্যে যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ বা মাৎসর্য প্রভৃতি রিপু রয়েছে—সে সম্বন্ধে এ দুনিয়ার মানুষ অল্প-বিস্তর সকলেই ছিলো ওয়াকিফহাল। তবে সে ষড়রিপুর মধ্যে কোন্‌টি আদি রিপু সে-সম্বন্ধে মনস্তাত্ত্বিক মহলে দীর্ঘকাল যাবৎ কোনো গবেষণা হয় নি। মানুষের জীবনে গোড়া থেকেই দুটো প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে। মানুষ তার নিজেকে জানার পূর্বে এ বিশ্বের আদি-সত্তাকে জানতে চেয়েছে এবং সে-সূত্রের আলোকে এ বিশ্বের সবগুলো দিকের ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হয়েছে। সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে লঘিষ্ঠতম নীতির দ্বারা গরিষ্ঠতম বিষয়ের ব্যাখ্যার দিকেই মানব-মানস ঝুঁকে পড়েছে। এ প্রবৃত্তি কেবল যে বিশ্বসত্তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেই মানব-জীবনে দেখা দিয়েছে, তাও নয়। পরবর্তীকালে মানব-মানসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেও মানুষ সেই একই ভাবধারা দ্বারা প্রণোদিত হয়ে অগ্রসর হয়েছে। কেউ বা এ বিশ্বের আদিসত্তাকে জড়, কেউ বা চৈতন্যময়, কেউ বা বিরাট জীবনীশক্তি বলে ধারণা ক'রে তার দ্বারা এ জগতের অপরাপর সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা দানে অগ্রসর হয়েছেন। সোফিস্টগণ

কর্তৃক মানব-মানসে জ্ঞানের উদয়, স্থিতি ও ব্যাপ্তির প্রশ্ন উত্থাপনের পরেই মানব-মানসে তার স্বকীয় রূপ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা সর্বপ্রথম দেখা দেয়। সক্রেটিস তাঁদের চিন্তাধারায় অসঙ্গতি প্রদর্শন করলেও তাঁদের চিন্তার উপাদানের ওপরই তাঁর ধারণা-সংক্রান্ত মতবাদ গঠন করেন। প্লেটো মনোজগতের অনুসন্ধানে আরো অগ্রসর হয়ে নানাবিধ সূত্র আবিষ্কার করেন, এবং এরিস্টটল তাঁর গুরুর ধারণাগুলোতে সামঞ্জস্য বিধানে অগ্রসর হন। তাঁর এ সাধনার ফলশ্রুতি হিসেবে আমরা পাচ্ছি মানব-মানসে নানাবিধ বৃত্তি ও প্রবৃত্তির স্বীকৃতি। তবে তাদের নিয়ামক নির্দেশকরূপে তিনি বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

সমগ্র মধ্যযুগে এরিস্টটলের নীতি স্বীকৃত ও গৃহীত হয়েছে বলে পেট্রিস্টিক বা স্কলাস্টিক দর্শনে খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে গ্রীক দর্শনের সমঝোতার সর্ববিধ প্রয়াস দেখা দিলেও মানব-মানসের আদিরূপ নিয়ে মধ্যযুগীয় দর্শনে কোনো অভিনব নীতি আবিষ্কৃত হয় নি। দর্শনশাস্ত্রে এ ধারাটি আধুনিক যুগেও অক্ষুণ্ন ছিলো। যুক্তিবাদী দার্শনিকগণের সর্বপ্রধান লক্ষ্য ছিলো যুক্তির মাধ্যমে সার-সত্তার আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠা। দেকার্তে, স্পিনোজা বা লাইবনিজ প্রত্যেকেই সার-সত্তার স্বরূপ নিয়ে যুক্তিসঙ্গত আলোচনা করেছেন। মানবাত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন নি।

প্রকৃতপক্ষে অভিজ্ঞতাবাদী লকের আবির্ভাবের ফলেই জ্ঞানের ক্ষেত্রে মানব-মানসের কার্যকারিতা নিয়ে দার্শনিক আলোচনার সূত্রপাত

হয়। তাঁর আলোচনার ত্রুটি প্রদর্শন করে বার্কলি এবং সর্বশেষে হিউম নানাবিধ দার্শনিক ধারণার অসারতা প্রমাণ করতে অগ্রসর হন।

হিউম-প্রবর্তিত এ ধারা আবার কাণ্টের দ্বারা যুক্তিবাদের সঙ্গে সমন্বয়ের সূত্রে আবদ্ধ হলেও, জীবাত্মার অনস্তিত্ব প্রভৃতি আবার সম্পূর্ণ প্রসারতা লাভে সমর্থ হয় নি। কাণ্ট জীবাত্মাকে অস্বীকার করলেও তুরীয় ঐক্যসূত্রের নীতি (Transcendental unity of apperception) স্বীকার করে জ্ঞানের ক্ষেত্রে মানব-মানসের কার্যকারিতা স্বীকার করে নিয়েছেন। এতে মানব-মানসের যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা পরবর্তীকালে উইলিয়াম জেমস্ স্বীকার করেন নি। তাঁর মতবাদ অনুসারে মানব-মানসে জ্ঞান বহতা স্রোতের মতো। তার মধ্যে যেমন বিষয়বস্তু থাকে, তেমনি সে বিষয়বস্তুকে বিন্যাসেরও সূত্রগুলো বিদ্যমান থাকে। কাজেই জ্ঞানের বিন্যাসের জন্যে কোনো তুরীয় ঐক্যের নীতি স্বীকার করার প্রয়োজন নেই।

জেমসের এ ব্যাখ্যার পরে মানবাত্মার স্বকীয় স্থিতিশীল অস্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্যের যে ক্ষীণ আশা ছিলো তাও বিলীন হয়ে যায়। জেমসের পরে ফ্রয়েড মানবাত্মা বা মানব-চেতনাকে স্বীকার করে যে মতবাদ প্রচার করেছেন, তার ফলশ্রুতি ছিলো সুদূরপ্রসারী। তিনি মানব-চেতনাকে নানাভাগে ভাগ করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন— মানব-চেতনা কাম-প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত। তার উপরিভাগে নানাকিছু দেখা দিলেও, তার গভীরে রয়েছে নানাবিধ কামনা ও বাসনা এবং

সে-সব কামনা বাসনার আদি স্থল যৌন-কামনা। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ সে যৌন-চেতনার দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে। তার প্রমাণ-স্বরূপ তিনি নানা উদাহরণ পেশ করেছেন। সেগুলোকে শৈশব-কালীন, অস্ফুট-চিত্ততার সময়, কৈশোরকালীন প্রভৃতি নানা পর্যায়ে ভাগ করে তিনি দেখাতে চেয়েছেন আমাদের যৌন-জীবনে রয়েছে প্রচণ্ড একটি জীবনীশক্তি (sexual elan vital)। এ জীবনীশক্তি বিভিন্ন পর্যায়ে আপনার স্বাভাবিক গতিতেই চলে বলে কোথাও অবরুদ্ধ (arrest) হয়ে গেলে তাতে বিকৃতি দেখা দেয়। যৌন-জীবনের নানাবিধ বিকৃতি এ জীবনীশক্তির অবরুদ্ধ-অবস্থার ফল। আত্মমেহন, সমকামিতা প্রভৃতি সে জীবনীশক্তির অবরুদ্ধ-অবস্থার পরিণতি ব্যতীত অন্য কিছুই নয়।

প্রশ্ন হচ্ছে, এতে কি মানব-মানসের সব দিকের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা পাওয়া যায়? যে শিশু মাতৃস্তন্য পান করার সঙ্গে সঙ্গে যৌনসুখও উপভোগ করে—সে শিশুকেই আবার কোল থেকে একটুখানি আলগা করতে গেলে আঁকড়ে ধরে কেন? এ আঁকড়ে ধরাতে তো যুক্তিবিদ্যা পাঠজনিত কোনো বিচার-বুদ্ধির কার্যকারিতা নেই। এটিও এক সহজাত প্রবৃত্তি। তাই একে কাম-প্রবৃত্তিজাত বলার কি সঙ্গত কারণ থাকতে পারে? সকল শিশুর মনে ভয়, ভীতি, আশঙ্কা রয়েছে। সেগুলো থেকে যে-সব কার্যকলাপ এদের জীবনে প্রকাশ পায়—তাদের যৌন-বাসনারই ফল বলে আখ্যাত করা কি সঙ্গত কারণ থাকতে পারে?

ফ্রয়েড যে-বিকাশের সূত্র আবিষ্কার করেছেন, তাকে যৌন-জীবনের সূত্র বলা যেতে পারে, তাকে মানব-মানসের সবগুলো ক্রিয়া-কলাপের সূত্র বলা যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ফ্রয়েড আমাদের কল্পনার মূলে একমাত্র যৌন-বাসনারই কার্যকারিতা দেখতে পেয়েছেন। যে কিশোর বা কিশোরী দিবাভাগে নানাবিধ স্বপ্ন দেখে — তা হয়তো বা তাদের অবরুদ্ধ যৌন-কামনারই ফল বলা যেতে পারে। তবে যে কল্পনা থেকে এ বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম কাব্যের সৃষ্টি, তাকে যৌনবাসনা থেকে উপজাত কিভাবে বলা যায়? উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—রুমী যখন তাঁর আত্মার মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন--"মৃত্তিকার অন্ধকার তলে/আমার সত্তা ছিল মিশে;/প্রস্তর আর লৌহপিণ্ড সাথে/স্তব্ধবাক বর্ণ-গন্ধহীন।" তখন তাঁর এ চেতনাকে যৌন-চেতনার এক পরিবর্তিত রূপ বলা যায় কিভাবে? যদি তার উত্তরে বলা যায়—সে যৌন-বাসনাই বাস্তব জীবনে পরিতৃপ্তি লাভ করতে না পেরে এ ক্ষেত্রে সর্বভূতে তার উপস্থিতির জোরালো দাবি ঘোষণা করছে। তাহলে এ ক্ষেত্রে বিচার্য বিষয় হবে, অতৃপ্ত বাসনা থেকেই যদি কাব্যের উৎপত্তি হয়—তাহলে তৃপ্ত বাসনা থেকে কি কোনো কাব্যের উৎপত্তি সম্ভবপর নয়? দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, শুধু অতৃপ্ত বাসনা থেকেই যদি কাব্যের উৎপত্তি হয়, তাহলে যে-সব ক্ষেত্রে কেবল অতৃপ্ত বাসনা রয়েছে—সে-সব ক্ষেত্রেই কি কেবল কাব্য সৃষ্টি সম্ভব?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ বলা যায়— কাম-জীবনের অতৃপ্ত বাসনা থেকেই কেবল কাব্যের উৎপত্তি হয়, এরূপ উক্তি সত্য নয়। কেননা

যাঁদের জীবনে ভোগের কোনো শেষ ছিলো না এমন ব্যক্তিরাও কবি হিসেবে কৃতিত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। অযোধ্যার নওয়াব ওয়াজেদ আলীর বিলাসের কাহিনী সর্বজনবিদিত; অথচ, কবি বা গীতিকার হিসেবে উর্দু সাহিত্যে তিনি এক বিশেষ স্থানের অধিকারী।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরদানকালে সকলেই একমত, কেবলমাত্র অতৃপ্ত বাসনা থাকলেই কবি হওয়া যায় না, তার সঙ্গে কল্পনা-নয়নেরও প্রয়োজন। কাজেই কাম-জীবনের সঙ্গে কাব্যসৃষ্টির সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য নয়, এ সত্যটি প্রমাণিত হয়।

মানব-মানসের সবগুলো বৃত্তি বা প্রবৃত্তির উৎপত্তি এ কাম থেকেই, এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আরো প্রমাণ রয়েছে। শৈশবে ছেলেমেয়েদের মধ্যে যুদ্ধস্পৃহা (Pugnacity) দেখা দেয়। কোনোভাবে উত্তেজিত না হয়ে শুধু শুধু পীড়নের উদ্দেশ্যে একটি শিশু অন্য একটি শিশুকে আঘাত করে আনন্দ পায়। এটি অতি পরিচিত এক দৃশ্য। একে কাম-বাসনার সঙ্গে সম্পৃক্ত একটি প্রবৃত্তি বলার সার্থকতা কোথায়? ফ্রয়েড অবশ্য কাম-স্রোতের প্রবাহকালীন পর্যায়ে পুরুষের ক্ষেত্রে ধর্ষ-কাম (Sadism) এবং মেয়েদের বেলায় মর্ষকাম (Masochism) নামক দুটো পরস্পরবিরোধী ভাবের উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতানুসারে পুরুষদের জীবনে নারীকে ধর্ষণ করবার এবং নারীদের জীবনে ধর্ষিতা হওয়ার জন্যে দুটো প্রবণতা রয়েছে। এ স্থলে কিন্তু সে-

ধর্ষকাম অপরিণত বয়স্ক ছেলেদের জীবনেই দেখা দিচ্ছে না—তা মেয়েদের জীবনেও দেখা দিচ্ছে। বরং শিশুদের জীবন গভীর-ভাবে পাঠ করলে দেখা যায়, অকস্মাৎ আক্রমণ করে পর্যুদস্ত করার মনোবৃত্তি মেয়েদের জীবনেই বেশি দেখা দেয়। কাজেই এ যুদ্ধস্পৃহাকে ধর্ষকামের অপরিণত রূপ বলা যায় না। যুদ্ধস্পৃহাকে একটি আদি প্রবৃত্তি বলেই গণ্য করতে হয়।

যুদ্ধ স্পৃহা থেকেই যে সবগুলো প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়েছে সে-সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাকডুগাল স্থির নিশ্চিত হলেও, তাঁর পোষকতার কোনো বলিষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যায় না। যুদ্ধস্পৃহা বা pugnacity থেকে প্রেম, দয়া, মায়া, মানব-সেবা প্রভৃতি সব কিছুরই উৎপত্তি ধারণা করা বড় দুরূহ ব্যাপার। অপরকে পীড়ন করার প্রবৃত্তি থেকে অপরকে সেবা বা সাহায্য করার প্রবৃত্তি হয়তো স্থল-বিশেষে দেখা দিতে পারে। রাজ্যবিস্তারের জন্যে রাজা সৈন্যদল পড়ে তুলে এ সৈন্যদের প্রত্যক্ষে না হোক পরোক্ষ সেবা করতে হয়। তবে সে সেবা একটি সাময়িক অভিনয় ব্যতীত আর কিছুই নয়। টাকা-পয়সা দিয়ে নানাবিধভাবে প্রলোভিত করে, তাদের মনে জিঘাংসা-বৃত্তি উজ্জীবিত করে তাদের সমরাঙ্গণে পাঠানো হয় এবং তাদের মধ্যে যেমন ভালোবাসা প্রভৃতি দেখা দেয়, তেমনি তাদেরও রাজা বা দেশ-প্রধানের মধ্যে সাময়িক-ভাবে এক প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। তবে তা নিতান্তই সাময়িক ব্যাপার। যে প্রেমিকাযুগল একজনের অদর্শনে আকুল হয়ে আত্ম-হত্যা করতে প্রস্তুত হয়, তাদের উভয়ের প্রেমের মূলে যুদ্ধস্পৃহা বর্তমান

তা কেমন করে বলা যায়। কাজেই এ ধরনের মতবাদকে সম্পূর্ণভাবে একদেশদর্শী মতবাদ বলা যায়। সেজন্যে আমাদের মানব-মনের আরো গভীরে প্রবেশ করতে হয়।

প্রথমত, মানব-মানসের এ প্রবণতাকে একটি সত্যিকার প্রবণতা বলে স্বীকার করা সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাক। সবগুলো প্রবৃত্তিকে মাত্র একটি বৃত্তি বা প্রবৃত্তির পরিবর্তিত রূপ বলে ব্যাখ্যা করার এ চেষ্টা আমাদের জীবনে সত্য হলেও, তার কোনো বিষয়ীমুখ (objective) প্রমাণ নেই। আমাদের বুঝাবার বা ব্যাখ্যা করার সুবিধার জন্যে আমরা সব কিছুকেই ঢালাও করে একটি উৎসেরই পরিবর্তিত রূপ বলে ধারণা করতে পারি, তবে বাস্তবে যে আমাদের এ প্রবণতার সপক্ষে একটি নির্ঘাৎ সত্য রয়েছে, তা প্রমাণ করা আমাদের সাধ্যাতীত।

তর্কের খাতিরে ধরে নেয়া যায়, বাস্তবে সত্য না হলেও, আমাদের জীবনে আমাদের মানসকে বুঝবার সুবিধার জন্যেই যদি আমরা এভাবে ব্যাখ্যা করি, এবং এতে যদি ব্যাখ্যাকৃত বিষয়ে সরলতা ও সবলতা দেখা দেয় তাহলে তাতে আপত্তির কোনো কারণ নেই। দ্বিতীয়ত, বিষয়মুখীন (objective) বলে আমরা যাদের দাবি করি, তারাও প্রকৃতপক্ষে মানব-মানসনিরপেক্ষ কিনা তাও ভেবে দেখবার বিষয়। কারণ এ বিশ্বসত্তা সম্বন্ধে যতগুলো মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে, তাতে বিশ্বসত্তার গুণের কোনো পরিবর্তন হয় নি। তাতে আমাদের মানসেরই পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। বিশ্বসত্তাও পরিবর্তনশীল হতে পারে।

তবে আমরা যেভাবে তাঁর সম্বন্ধে নানা পরিবর্তনশীল মতবাদ প্রচার ও পোষণ করেছি, তার সঙ্গে সমতালে তার পরিবর্তন দেখা দিয়েছে বলে ধারণা করার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

কাজেই আমাদের মতবাদের পরিবর্তন ও পরিবর্ধনকে আমাদেরই জ্ঞানের স্থবিধার জন্যে আবিষ্কৃত ও প্রচলিত কতকগুলো মানসিক ক্রিয়া বলা যায়; যে ক্রিয়াগুলোর আবিষ্কারই হচ্ছে বিজ্ঞান তথা দর্শনের প্রকৃত কাজ। তবে সেগুলো বাস্তব হোক বা মানসিক ক্রিয়াই হোক, তার দ্বারা বাস্তব বা আন্তর-জগতের সবগুলো বিষয়ের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা হওয়া দরকার। এ নীতির আলোকে বিচার করলে যৌন-আকাঙ্ক্ষা বা যুদ্ধস্পৃহাকে মানব-মানসের আদিম প্রবৃত্তি বলা যায় না। কেননা ওগুলো দ্বারা মানব-মানসের অপরাপর বৃত্তিগুলোর উৎপত্তি ও বিকাশ সম্যকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাদের চেয়ে আরো গভীরতর ও সামগ্রিক প্রবৃত্তি হচ্ছে আত্মস্থিতি বা Self-preservation। মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এ বিশ্বে বা বিশ্বাতীত কোনো সত্তায় আপনাকে স্থিত করতে চায়। এরই নাম আত্ম-স্থিতি বা Self-pieservation-এর প্রবৃত্তি। এ প্রবৃত্তি মানুষের জীবনে প্রথম পর্যায়ে দেখা দেয় আত্ম-প্রতিষ্ঠার (Self-preservation) প্রবৃত্তি হিসেবে। আত্মরক্ষাই নানাভাবে দেখা দিয়ে ব্যষ্টিকে এ বিশ্বে রক্ষা করতে সমর্থ হয়। আত্মরক্ষা প্রথমে দেখা দেয় এ বিশ্বের অন্য সকল জীব থেকে আপনাকে পৃথক করার প্রবৃত্তি হিসেবে। তাকে অহমিকা বোধ বা Sense of individuation বলা যায়। এ জগতে আমার সত্তা অন্যান্য সকল থেকে

পৃথক—এ বোধ হচ্ছে আত্মরক্ষার একটি প্রাথমিক উপায়। এজন্যে অতি শৈশবেই মানুষের জীবনে অপর থেকে পৃথক হয়ে সাশ্রয়ী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়। তার জন্যে সে শারীরিক ও মানসিক শক্তির অধিকারী হতে চায়। কারণ এ শক্তি ব্যতীত সে স্বাধীনভাবে চলতে পারে না। এ জন্যে তার পক্ষে পরস্পরবিরোধী আরো দুটো প্রবৃত্তির কার্যকারিতার প্রয়োজন। একটি যুদ্ধস্পৃহা, অপরটি মৈত্রী। যে-স্থলে তার অহমকে রক্ষা করতে চেয়ে সে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়, সেক্ষেত্রে সে যুদ্ধের মাধ্যমে তাকে রক্ষা করতে চায় এবং যাতে তার এ অহম অতি সহজেই বিকাশলাভে সমর্থ হয়—তার সঙ্গে তার প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। পিতা মাতা ভাই বোন অর্থাৎ পরিবারের সকল লোকদের মধ্যে যারা তার অহম্-বোধের বিকাশেও আত্মরক্ষায় সাহায্য করে তাদের প্রতি স্বভাবতই মৈত্রীর ভাব দেখা দেয়, এবং যারা তার এ চেতনাতে আঘাত হানে, তাদের প্রতি বৈরীভাব পোষণ করে—তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়। আবার এ আত্মরক্ষার প্রবৃত্তির কার্যকারিতার সঙ্গে সঙ্গে মানব-মানসে দেখা দেয় আত্ম-সংরক্ষণ বা Self-preservation-এর প্রবৃত্তিগুলো। এদের মধ্যে যৌন-বাসনা (sexual desire), যূথচারী প্রবৃত্তি (Gregarious instinct), পরার্থপরতাবোধ (instinct of altruism), অপত্য ও রক্তস্নেহ (instinct of parenthood). প্রকৃতির রহস্য ভেদের জন্যে কামনা (instinct for knowing the secrets of the universe), পরলোক সম্বন্ধে জ্ঞানের বাসনা (desire for knowing the facts of the future life) প্রভৃতি নানাবিধ প্রবৃত্তিগুলোর কার্যকারিতা চলতে থাকে।

মানুষ এ বিশ্বে একটা স্থায়ী আসন পেতে চায়। সে-স্থায়ী আসন লাভের জন্যেই যৌন-কামনা তার মধ্যে দেখা দেয়। সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে এ দুনিয়ায় তার এ আসন প্রতিষ্ঠা করার প্রবণতা সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল না থাকলেও, সন্তানের অভাব থেকেও সন্তানের ব্যর্থতার সময় এ বৃত্তিটির স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়ে। যদি কেবলমাত্র যৌন-বাসনার পরিতৃপ্তির জন্যেই মানুষ ইন্দ্রিয় পরিচালনায় লিপ্ত হতো, তাহলে এতে চরম পরিতৃপ্তি লাভ করেও নিঃসন্তান হলে তার জীবনে এতো আফসোস দেখা দিতো না। যৌন-জীবনে চরম পরিতৃপ্তি লাভে পরিতুষ্ট নর-নারীর জীবনে সন্তানের অভাবজনিত বেদনাতে প্রমাণিত হয়, সন্তান লাভের বাসনার জন্যেই মানুষ যৌনসম্মিলনে প্রবৃত্ত হয়। তবে সে-সন্তান অকর্মণ্য হলে পুনরায় তার জীবনে দেখা দেয় ব্যর্থতা। কারণ মানুষ বুঝতে পারে এ সন্তানের দ্বারা এ জগতে তার প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হবে না। এজন্যেই সন্তানহীন দম্পতি দত্তক-পুত্র গ্রহণ করে এবং সন্তান থাকা সত্ত্বেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানুষ অপরের সন্তানের পরিচর্যায় লিপ্ত হয়।

এ আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি থেকেই মানুষের জীবনে যূথচারী প্রবৃত্তি দেখা দেয়। মানুষ একাকী এ জগতে প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হয় না বলে অপর মানুষের সঙ্গে মিলিত হয়ে সে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চায়। ছেলেবেলা থেকেই মানুষের জীবনে দেখা দেয় অপরের সঙ্গে একত্রে আহার-বিহারের প্রবৃত্তি, অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আনন্দ

উপভোগ করার প্রবৃত্তি। বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন বর্ণের ও রক্তের ছোট ছোট শিশুদের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে খেলাধূলায় প্রবৃত্ত হওয়ার মধ্যে সে-প্রবৃত্তি প্রকাশ পায়। এ প্রবৃত্তির মূলেও রয়েছে আত্ম-প্রতিষ্ঠার সে-লক্ষ্য। মানুষের জীবনে একদিকে প্রকৃতি সহায়ক। প্রকৃতির কোলেই মানুষ গড়ে ওঠে। তেমনি এ প্রকৃতির বুকে মানুষকে প্রচণ্ড সংগ্রাম করেই অগ্রসর হতে হয়। ঝড়, ঝঞ্ঝা, বন্যা, ভূমিকম্প, সাইক্লোন, তুষারপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মানুষ সংঘবদ্ধ হয়েই কেবল বাঁচতে পারে। এজন্যেই সংঘবদ্ধ হয়ে টিকে থাকার প্রস্তুতিস্বরূপ তার মধ্যে সে-যূথচারী প্রবৃত্তি দেখা দেয়। তেমনি সেই একই প্রকৃতির বুকে মানুষের ভীষণ শত্রু নানাবিধ জন্তু ও জানোয়ারেরা মানুষকে সব সময়ই পর্যুদস্ত করতে চায়। এদের আক্রমণ থেকে টিকে থাকার জন্যেও মানুষের পক্ষে এ যূথচারী প্রবৃত্তির প্রয়োজন রয়েছে। তবে উভয় ক্ষেত্রেই এ যূথচারী প্রবৃত্তির লক্ষ্য মানুষকে এ পৃথিবীর বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

মানুষের জীবনে অতি শৈশবকালেই পরার্থপরতার উদাহরণ পাওয়া যায়। আনন্দে অধীর হয়ে শিশুরা তাদের অংশের খাবার তার সাথীকে দিয়ে দিতে চায়। অথবা সে-সাথীকে কেউ আক্রমণ করলে তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়। এ পরার্থপরতারও মূলে রয়েছে আত্মপ্রতিষ্ঠা। আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে হলে আপনার ভাবধারা অপরের মধ্যে সঞ্চার করা দরকার। এজন্যে ছেলেবেলা থেকেই শিশুদের মনে ধর্মান্তকরণের (conversion) চেষ্টা দেখা যায়।

পূর্বেই বলা হয়েছে—যৌনবাসনা মানুষের মনে ক্রিয়াশীল থাকে ছেলেবেলা থেকেই। এ বাসনার লক্ষ্য হচ্ছে আত্ম-প্রতিষ্ঠা বা self-preservation। সন্তানের মাধ্যমে মানুষ এ দুনিয়ায় অমর হয়ে থাকতে চায় বলেই সন্তানলাভের জন্য মানুষ এতো লালায়িত হয়। সে অপত্য-স্নেহ দেখা দেয় সন্তানলাভের পরে। সন্তানের সুখদুঃখে মানুষ অংশগ্রহণ করে। তবে এ সন্তান-স্নেহ যৌন-বাসনার সঙ্গে যুক্ত হলেও আপনার সন্তান ব্যতীত অপরের সন্তানের প্রতিও মানুষের মনে রয়েছে স্নেহ। অপরের সন্তানকে মানুষ কেন ভালোবাসে ? তার কারণ সন্তান-মাত্রের মধ্যে মানুষ তার প্রতিষ্ঠা-লাভ প্রত্যাশা করে। এজন্যে যাদের কোনোকালে সন্তানলাভ হয় নি, তারাও অপরের সন্তানকে ভালোবেসে আনন্দ পায়।

সন্তান-স্নেহের সঙ্গে সঙ্গে মানব-জীবনে দেখা দেয় রক্তস্নেহ। রক্তসম্বন্ধে যাদের সঙ্গে মানুষের যোগ রয়েছে, তাদের উত্থান-পতনে মানুষ আনন্দিত বা ব্যথিত হয়। কারণ মানব-জীবনে রয়েছে আত্ম-প্রতিষ্ঠার বাসনা, মানুষ মনে করে যাদের সঙ্গে তাদের রক্ত-সম্বন্ধ রয়েছে, তাদের দ্বারা জীবনকালে হোক বা না হোক, মৃত্যুর পরেই হোক, তাদের স্মৃতি অমর হয়ে থাকার সম্ভাবনা।

মানুষের জীবনে রহস্য-ভেদের জন্যেও রয়েছে অত্যন্ত প্রবল বাসনা। সে-রহস্য সর্বপ্রথম তার জন্ম-সংক্রান্ত। সে-রহস্য পরবর্তী-কালে তার কাছে উপস্থিত হয় এ পৃথিবীর উৎপত্তি ও স্বরূপ নিয়ে।

সে-রহস্যের সর্বশেষ সমস্যা হ'চেছ তার জীবনের শেষ পরিণতি। অতি শৈশবেই মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে—সে কোথা থেকে এলো ? রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে তা বুঝাতে পেরে বিশ্বের সব খোকাদের প্রতিনিধি হয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন—"খোকা মাকে শুধায় ডেকে/ এলেম আমি কোথা থেকে/কোথা থেকে কুড়িয়ে পেলি/আমারে—"। সে খোকাই এ বিশ্বে কোথা থেকে এলো এবং কার শক্তিতে পরিচালিত হচেছ—এ নিয়ে চিন্তা করে। এ বিশ্বে তার স্থান কোথায় ? এ পৃথিবী বাস্তবিকপক্ষে তাকে ভালোবাসে, না এ পৃথিবী তার আজন্ম-শত্রু, এ নিয়ে তার মনে নানাবিধ প্রশ্নের উদয় হয়। পরিণত বয়সে তার মনে তার নিজের জীবনের সর্বশেষ পরিণতি সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন উদিত হয়। অনিবার্য মৃত্যু থেকে না হয় রেহাই না-ই পেলো, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার জীবন শেষ হয়ে যাবে, এ ধারণা তার কাছে বড়ই নিষ্ঠুর। কারণ আগেই বলা হয়েছে, এ জগতে মানুষ বেঁচে থাকতে চায়। এ বেঁচে থাকার বাসনাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনবদ্য ভাষায় বলেছেন "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে/মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই/এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে জীবন্ত হৃদয় মাঝে/যদি স্থান পাই—"; কবি শর্ত আরোপ করেছেন—যদি এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে জীবন্ত হৃদয় মাঝে স্থান পান, তাহলেই তিনি মরতে চাইবেন না। কিন্তু সূর্যকরে বা পুষ্পিত কাননে স্থান না পেলেও, কোনো মানুষই মরতে চায় না। সকলেই চিরকাল অমর হয়েই থাকতে চায়। অগত্যা যদিও বা মৃত্যুর সমমুখীন হয়, তা হলেও যাতে মৃত্যুর পরে তার স্মৃতি থাকে উজ্জ্বল ও ভাস্বর

হয়ে, এজন্যে মানুষ এ পৃথিবীর রহস্য ভেদ করে তার সত্যিকার রূপের সঙ্গে পরিচিত হতে চায়। এ বাসনারই অপর রূপ হচ্ছে পরলোক সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষা। মৃত্যুর পরে আমরা কোথায় যাচ্ছি? সেখানে আমাদের পার্থিব সুখ-দুঃখের মূল্য কি, সে-লোকে কিভাবে বাস করবে ইত্যাদি প্রশ্নের মীমাংসা মানুষ করতে চায়। নানা দেশের কবি ও দার্শনিক এ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তরও দিয়েছেন, তবে আজ পর্যন্ত তার কোনো মীমাংসা হয় নি। এ সম্বন্ধে বিশ্ব-সাহিত্যে সর্বপ্রথম প্রশ্ন তুলেছেন উমর খৈয়াম—"কেনই বা মোর জন্ম নেওয়া – এই যে বিপুল বিশ্ব মাঝা/জন্মকালে ইচ্ছাটা মোর কেউ তো কভু শুধায় নাই—" এ প্রশ্ন, মানুষের চিরন্তন প্রশ্ন। কারণ জন্ম হলেই মৃত্যু অনিবার্য। অথচ মৃত্যুর পরবর্তী পর্যায় সম্বন্ধে মানুষ কোনো সদুত্তর খুঁজে পাচ্ছে না। এক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। আজ পর্যন্ত মানবাত্মা সম্বন্ধে যতগুলো গবেষণা হয়েছে, তাতে আত্মার অমরত্ব প্রমাণিত হয় নি। তবে এ অমরত্বকে প্রমাণ করার চেষ্টার এখনও শেষ হয় নি বলে এ সিদ্ধান্ত করা যায়, মানুষ আত্মার অমরত্ব মনেপ্রাণে কামনা করে।

এসব প্রবৃত্তির আদিতে রয়েছে আত্ম-স্থিতি বা (self-preservation)। আত্ম-স্থিতির সেই আদিম বাসনা থেকেই এ প্রবৃত্তিগুলো দেখা দেয়। এগুলো যে সময়ের কোনো নির্দিষ্টক্ষণে দেখা দেয়,

তা-ও নয়। যুদ্ধস্পৃহার পরে, শক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি দেখা দেবে, এমন কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। মানব-মানসে এক ও অবিভাজ্য বলে কোনো সময় এটি বা অন্য কোনো সময় অপরটি দেখা দিতে পারে। অথবা একটির কার্যকারিতার সময় অপরটি সাময়িকভাবে উহ্য থাকতে পারে। তবে তাদের সব কটির কার্যকারিতা রয়েছে আমাদের জীবনে। এজন্যেই আমাদের পক্ষে বিভ্রান্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। কোনো এক বিশেষ সময়ে একটি বৃত্তির কার্যকারিতা দেখে আমরা মনে করি, এইটেই বোধ হয় আমাদের আদি ও অকৃত্রিম বৃত্তি।

পূর্বেই বলা হয়েছে মানুষের জীবনে দেখা দেয় আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি। এ আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিই আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রথম সোপান। কারণ আত্ম-রক্ষা না হলে আত্মপ্রতিষ্ঠা সম্ভবপর নয়, আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে মানুষ ব্যক্তিগতভাবে, সামাজিকভাবে, বা জাতিগতভাবে, নানাবিধ কীর্তি-কলাপে লিপ্ত হয়। পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য সে আত্মপ্রতিষ্ঠারই এক একটি মহানিদর্শন। আগ্রার তাজমহল, মিসরের পিরামিড, ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান, মস্কোর ঘণ্টা প্রভৃতি সে-আত্মপ্রতিষ্ঠারই এক একটি বিরাট নিদর্শন। ভারতের মুঘল বাদশাহ শাহজাহান তাঁর প্রিয়তমা মহিষী মমতাজমহলের স্মৃতিরক্ষাকল্পে তাজমহল তৈরি করেছিলেন বলে ইতিহাসে তাঁর কীর্তি অমর হয়েই বিরাজমান। এ-তাজমহল সৃষ্টির ফলে তিনি যশ ও কলঙ্ক উভয়ের ভাগী হয়েছেন। প্রিয়তমা মহি-ষীর প্রতি এ সৃষ্টিতে প্রগাঢ় প্রেম প্রকটিত হলেও, একটি রাষ্ট্রের

কোষাগারকে তিনি এভাবে ব্যক্তিগত অভিলাষ চরিতার্থ করার বাসনায় উজাড় করেছেন বলে তাঁকে অত্যন্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বার্থপর বাদশাহ বলা যায়।

তাঁর চরিত্রের এ উভয় দিকের বাইরেও একটি দিক প্রকাশিত হয়েছে। সেটি হচ্ছে তাঁর মহিষীকে অমর করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজেকেও অমর করে এ পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা করার বাসনা। এ সম্বন্ধে বোধ হয় তর্কের কোনো অবকাশ নেই। যে যত বড় ও উচ্চ-মানসের এবং যত বড় সৃজনধর্মী প্রতিভার অধিকারীই হোন না কেন, এ বিশ্বে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ তাঁর জীবনের চরম কাম্য – সে বিষয়ে স্থির নিশ্চিত হওয়ার জোরালো উপাদান বর্তমান।

ধর্মীয় চেতনার উৎপত্তি ও বিকাশ

আমরা পূর্ব-বর্ণিত আলোচনার পরিসমাপ্তিতে দেখতে পেয়েছি, এ জীবনে আত্মরক্ষার ও আত্ম-সংরক্ষণের বাসনা মানব-জীবনের মৌল বা সর্বপ্রধান বৃত্তি। একে অমরত্ব লাভের বাসনা বলেও অভিহিত করা যায়। এ ধারণার বিরুদ্ধে অবশ্য কোনো কোনো মহল থেকে এ প্রশ্ন উঠতে পারে: অমরত্ব লাভই যদি জীবনের আদি কামনার বিষয় হয়, তা হলে মানুষ আত্মহত্যা করে কেন? তার উত্তরে বলা যায়—মানুষের মধ্যে যারা আত্মহত্যা করে তারা এ জগতে তাদের নিজেদের রক্ষা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলে মনে করে, তারা এ ব্যর্থতার ফলেই আত্মহত্যা করে। যারা আত্মহত্যা করে, তাদের মানসেও এ আত্ম-হননের পরে অপরাপর মানুষের স্মৃতিতে জীবন্ত থাকার বাসনা থাকে। কাজেই তারাও অমর হওয়ার বাসনা তাদের মানসে পোষণ করে। এতেই প্রমাণিত হয় তাদের মানসেও অপরাপর মানুষের মতো একই কামনার ধারা প্রবহমান। পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে তাদের নিজস্ব স্থিতি টিকিয়ে রাখা সম্ভবপর নয় বলেই তারা এ পন্থা অবলম্বন করে। গোড়াতে আত্মরক্ষার বাসনা তাদের মানসে না থাকলে—আত্মরক্ষার পূর্বে তারা বেঁচে থাকার জন্যে কোনো চেষ্টা করত না।

এ অমরত্ব লাভের জন্যেই মানুষের জীবনে জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন ও ও ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ের উৎপত্তি হয়। বিজ্ঞানের দৌলতে এ বিশ্বে মানুষ আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়। দর্শন ও ধর্মের মাধ্যমে মানুষ একদিকে যেমন আত্মরক্ষা করতে সচেষ্ট হয়, তেমনি কালের বুকে অমর হয়ে টিকে থাকতে চায়। তবে ধর্ম ও দর্শনের উৎপত্তিতে সে একই বাসনায় কার্যকরী থাকলেও তাতে প্রত্যয় ও যুক্তির রয়েছে ভিন্নমুখী কার্যকারিতা। এ সম্বন্ধে বিচার করার জন্য আমাদের গুহামানবের জীবনের আলোচনায় ফিরে যেতে হবে।

গুহামানবের জীবনে প্রত্যয় ও যুক্তি সম্বন্ধে কোনো সজ্ঞান পার্থক্য নেই। সে প্রত্যেকদিনই উদয় ও অস্ত প্রত্যক্ষ করে। এগুলো তার সরাসরি অভিজ্ঞতা। এ নিশ্চিত ও অপরিবর্তনীয় অভিজ্ঞতা থেকে এ দৃশ্য প্রতিদিন একইভাবে দেখার প্রত্যয় যেমন তার মানসে দেখা দেবে, তেমনি কোন্ সময় সূর্য উদিত হবে বা কোন্ সময় অস্ত যাবে সে সম্বন্ধে পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করার মতো মানস-শক্তির সম্বন্ধে তার একটা প্রত্যয় দৃঢ় হতে থাকবে। এ ক্ষেত্রে প্রত্যয় ও যুক্তির মধ্যে কোনটা পূর্বে বা কোনটা পরে দেখা দেবে নির্ণয় করা কঠিন। এতে একটা বৃত্ত রয়েছে। এ ক্ষেত্রে তার প্রত্যয়ের দ্বারা প্ররোচিত হয়েই সে এ অভিজ্ঞতা লাভ করছে, এবং তার এ অভিজ্ঞতা তার প্রাথমিক প্রত্যয়কে সমর্থন করছে। জীবন বিকাশের পথে তার কাছে সূর্যোদয়ের ও সূর্যাস্তের এ ধারার মধ্যে যে অনিবার্যতা রয়েছে, তা সকল ক্ষেত্রে না পেয়ে, তার জীবনে নিরাশার ভাব দেখা দিতে পারে।

সে হয়তো তার কাছে অবস্থিত সমতল ভূমিতে যে সব গাছের মধ্যে নানাবিধ ফলমূলাদি প্রত্যাশা করেছে, হয়তো অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির দরুন তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে তার জীবনে প্রকৃতির বদান্যতার প্রতি যে আস্থা রয়েছে তার মূলে রয়েছে যুক্তি। তাতে ভ্রান্তি দেখা দিতে পারে। সে সচরাচর দেখতে পেয়েছে, গাছে মুকুল পর্যাপ্ত পরিমাণে দেখা দিলে, ফলও তদনুরূপ হয়। এজন্যেই সে এরূপ যুক্তিসঙ্গত প্রত্যাশা করেছে। তার পক্ষে ফসলের মওসুমের অপেক্ষা করেই এরূপ আশা পোষণ করা উচিৎ ছিল। সে তা করেনি, তার অভিজ্ঞতার ও যুক্তির উপর নির্ভর করেই এতে প্রত্যয়শীল হয়েছে।

এ উদাহরণ থেকে তা হলে আমরা এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে, প্রত্যয় এবং যুক্তি একইসঙ্গে তার জীবনে কার্যকরী ছিল, এবং তারা একে অপরের উপর ক্রিয়াশীল ছিলো। প্রত্যয়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত না হলে মানব-সমাজে কোনো প্রগতি সম্ভবপর হতো না। তেমনি মানব-জীবনের পক্ষে কোনো অভিজ্ঞতা ও সম্ভাবনা থাকতো না। অপরদিকে অবিমিশ্র যুক্তির দ্বারা এরূপ খাঁটী প্রত্যয়ও প্রতারিত হতে পারে। পরবর্তী পর্যায়ে যখন মানবসমাজ কতকটা স্থায়ী হয় ও প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন শক্তি সম্বন্ধে চিন্তা করার অবসর পায় এবং প্রকৃতির দাসত্ব থেকে কতকটা মুক্তিলাভ করে, তখন তার পক্ষে সে শক্তিগুলোকে আবিষ্কার এবং প্রকৃতির বুকে তাদের ভূমিকার যথাযথ স্থান নিরূপণ করতে সে বাধ্য হয়। পুরাকালের
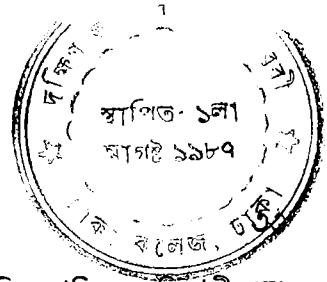
মানুষের পক্ষে এসব শক্তিকে অতি মানবিক শক্তির অধিকারী এবং মানবজ্ঞানের নিয়ন্ত্রণকারী বলে কল্পনা করা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। এ প্রত্যয় জীবনের প্রয়োজনেই দেখা দেয়। কারণ এরূপ নরাত্মারূপী (Anthropomorphic) ধারণা মানবজীবনের পক্ষে এসব শক্তিকে শান্ত করার পক্ষেও প্রয়োজনীয় ছিলো। এরূপ ধারণার পরিপোষকতা যুক্তির মধ্যেও ছিল। কারণ ব্যক্তিত্বশালী না হলে এ জাতীয় দেবদেবীগণের পক্ষে মানবজীবনের অমঙ্গলকর বিষয়গুলোর উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর ছিলো না। এজন্যেই দেখা যায়, সে পর্যায়ে যুক্তি ও প্রত্যয়ের মধ্যে কোনো উল্লেখ্য ব্যবধান ছিলো না।

প্রকৃতপক্ষে প্রত্যয় ও যুক্তির মধ্যে এ ব্যবধান দেখা দেয় যখন একদল লোক দেবদেবীদের আচরণের একমাত্র ব্যাখ্যাকর্তা হিসেবে তাদের দাবী করে। অবশ্য কালের ধারায় এসব দেব-দেবী সম্পর্কে ধারণা একমেবদ্বিতীয়ম বা একেশ্বরবাদেও পরিণত হয়েছে। তা সত্ত্বেও পূর্বোক্ত শ্রেণীর লোকেরা বা পুরোহিতগণ সে স্তরে পেঁৗছে শান্তি স্বস্ত্যয়ন বা ভবিষ্যদ্বাণী করার অধিকার হারায়নি। তখন থেকেই প্রত্যয়কে ধর্মের সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখা হয়েছে এবং যুক্তিকে জ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। তবে এ পার্থক্যের মূলেও বিশেষ কোনো প্রমাণ নেই।

মানবসমাজে প্রত্যয় ও যুক্তির স্থান নির্ণয়ের জন্যে আমাদের জীবন্ত ধর্মগুলোর ইতিহাস ও ঐতিহ্য পাঠ করা উচিৎ। এক্ষেত্রে

উচিৎ জীবন্ত ধর্মের আলোচনা করা। কারণ মৃত ধর্মের সবগুলো বিষয় ও পর্যায় সম্বন্ধে সঠিক আলোচনা সম্ভবপর নয়। ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে মৃত ধর্মের অবদান নির্ণয় করাও সহজ নয়। সময়ের ক্রম অনুসারে এ সকল ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করলে—সর্বপ্রথমে হিন্দু-ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করতে হয়। তার পরে বৌদ্ধ, তাওবাদ, কনফিউসিয়াসের মতবাদ, ইহুদীধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলাম সম্বন্ধে আলোচনা করতে হয়। এসকল ধর্ম থেকে যে ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়েছে, তাতে বিশেষত্ব রয়েছে। তবে তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই একটা সাধারণ ঐতিহ্য বর্তমান। তা হচ্ছে মানবতাকে এ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান বলে সকল ধর্মেই স্বীকৃত। সকল ধর্মেই এ বিশ্ব-চরাচরে মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দান করা হয়েছে। এ প্রত্যয় সকল ধর্মেই বর্তমান। এ প্রত্যয় কেবল প্রত্যেকটি ধর্মেই বর্তমান নয়, সকল দার্শনিক মতবাদেও পরোক্ষে স্বীকৃত।

হিন্দুধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিণতি বেদান্তের মধ্যে যে ঐতিহ্য বর্তমান, তাকে এ বিশ্বের বা জীবাত্মার যে স্বরূপ বর্তমান—তা সম্পূর্ণভাবে অধ্যাস-প্রসূত। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মের মধ্যে মায়ার প্রভাবের ফলে অথবা জীবাত্মার মধ্যে অবিদ্যার প্রভাবের ফলে এ-জগৎ অথবা জীবাত্মা ব্রহ্ম থেকে পৃথক সত্তাস্বরূপ প্রতিভাত হয়। জীবাত্মার লক্ষ্য হচ্ছে এ মায়া প্রপঞ্চ থেকে মুক্তিলাভ করে—তার প্রকৃত সত্তা অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বাদ গ্রহণ। একেই হিন্দুধর্মে বলা হয় মোক্ষ। যদিও এ মতবাদকে বৈদান্তিক ধর্ম বলা যায়, তবুও হিন্দুধর্মের অপর

শাখাগুলো যথা—বৈষ্ণব, শাক্ত ও শৈব—শাখাতেও এ পৃথিবী বা জীবাত্মার অনিত্যতা সম্বন্ধে প্রকৃত উপদেশ রয়েছে। বেদান্তের সঙ্গে তাদের পার্থক্য শুধু এখানে যে, বৈদান্তিক ধর্মের প্রেক্ষাপটে নৈর্ব্যক্তিক সত্তা বর্তমান, অপরদিকে পূর্বোক্ত ধর্মগুলোতে দেবদেবীগণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তবে তা সত্ত্বেও তারা সারাবিশ্বে পরিব্যাপ্ত; এ সকল ধর্মে যুক্তির কার্যকারিতাকে হীন মনে করার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। কারণ যদিও ব্রহ্মের ধারণা ব্রহ্মসূত্র থেকেই বিবর্তিত হয়েছে এবং তাতে কোনো সজ্ঞান ব্যষ্টি-মানসের ক্রিয়াশীলতা নেই, তবুও এ ধারণার ক্রমবিকাশের মধ্যে যুক্তির কার্যকারিতা রয়েছে। এ চেতনাতে সকল দেবদেবীর মধ্যে একটা সাধারণ গুণ হিসেবে দীপ্তি বা (luminousness) বা জ্যোতি আবিষ্কৃত হয়েছে। আদি জ্যোতি বিকীরণ থেকে তারা দেবদেবীদের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন। ঋক্‌বেদে যে ফল দেবদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়, তাদের প্রত্যেকের মধ্যে জ্যোতি রয়েছে। তা ছাড়া এ শব্দের ভাষ্য প্রসঙ্গে অত্যন্ত শক্তিশালী দ্বন্দ্বমূলক ন্যায়ের ব্যবহার করা হয়েছে। তা এখন পর্যন্ত অত্যন্ত সূক্ষ্ম উচ্চশ্রেণীর প্রমাণের নিদর্শনস্বরূপ বর্তমান। এরূপভাবে—বিষ্ণু, শিব, এবং কালীর বা চণ্ডির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্যে বিষ্ণুপুরাণ, শিবসংহিতা এবং তন্ত্রের মধ্যে অত্যন্ত জোরালো তর্কের অবতারণা করা হয়েছে। বৌদ্ধধর্মে বেদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ রয়েছে; তা সত্ত্বেও তাতে প্রত্যয় থেকে যুক্তির প্রাধান্য বর্তমান। বুদ্ধ তাঁর শিষ্যগণকে কোনো তত্ত্বীয় সত্তায় বিশ্বাস স্থাপন করার জন্যে আদেশ করেননি। তিনি জীবনের

সর্বত্র প্রকটিত কতকগুলো সত্যকে প্রাথমিক পর্যায়ে স্বীকার করে নিয়েছেন। সেগুলো সকল কালেই অনস্বীকার্য। কেউই অস্বীকার করতে পারে না যে, মানব-মানসে বার্ধক্যজনিত জরা, ব্যাধি এবং মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার সহজাত বাসনা রয়েছে। এসব থেকে মুক্তি পাওয়ার মাধ্যমও অনেকটা প্রমাণ-সাপেক্ষ। তিনি নির্বাণের যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর প্রধান শিষ্যদের মধ্যে যারা এ অবস্থায় উন্নীত হয়েছিলেন তাকে এ হিসেবে প্রমাণযোগ্য বলা যায়। তার একটা প্রায়োগিক মূল্য তৎকালীন সমাজে রয়েছে। তার মতবাদের তত্ত্বীয় প্রেক্ষাপটকে শূন্য বলা হয়। এ শূন্যকে এ পথের পথিকদের দ্বারা পরীক্ষণের একটা প্রকল্প বলা যায়। এক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্মের আচরণকে অনেকটা অবরোহ পদ্ধতিজাত বলা যায়। কেননা তাদের প্রত্যয় যুক্তির অনুসারী। সঙ্গে সঙ্গে এ ধর্মকে সার্বিকভাবে প্রত্যয়ের প্রাধান্য থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে এক বিদ্রোহ বলা যায় এবং নৈতিক যুক্তিকে প্রত্যয়ের উপর নির্ভরশীল না করে, তার স্বকীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্যে এক বিপ্লব বলা যায়।

টায়োর মতবাদকে তিনটে অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। একে প্রথমে—আদিসত্তার পথ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে টায়োকে "কেবলমাত্র মরমী অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমেই জানা যায়—তাকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।" যদি এ অর্থে টায়োকে তুরীয় বলা যায়, তা সত্ত্বেও টায়ো সর্বব্যাপি সত্তা। "এ অর্থে—টায়ো এ বিশ্বজগতের পথ, তার মানদণ্ড, তার তাল, প্রকৃতিতে তার চালকশক্তি সকল প্রকার

জীবনের চালকনীতি, সকল জীবনের পশ্চাদপটে অবস্থিত বিন্যাসের নীতি—একে এ পৃথিবীর মাতা বলা যায়। তৃতীয় অর্থে টায়ো শব্দের অর্থ হচ্ছে – যেভাবে মানুষ তার জীবনকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পদ্ধতিতে বিন্যাস করবে। এ ক্ষেত্রে সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন করা যেতে পারে—কোন উপায়ে এ আবিষ্কার করা হয়েছে? তার উত্তরে বলা যায়, মরমী অন্তর্দৃষ্টি ব্যতীত তাকে জানার কোনো উপায় নেই। এ মতবাদ স্বীকার করলে আমাদের পক্ষে এক মহা বৃত্তের মধ্যে আবর্তিত হতে হবে। কারণ, মরমী অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের পক্ষে মরমী অন্তর্দৃষ্টির সত্য উপলব্ধি করতে হবে এবং সে মরমী দৃষ্টিকে মরমী দৃষ্টির আলোকেই জানতে হবে। এতে অনিবার্যভাবে পুনরুক্তির সৃষ্টি হবে। এজন্যে তার সত্যাসত্য অন্য মাধ্যমের দ্বারাই নির্ধারিত করতে হবে এবং এক্ষেত্রে যুক্তির একটা নীতি স্বীকার করেই তার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অপরদিকে বৌদ্ধধর্মের মতো এ ধর্মমত মানুষের নৈতিক জীবনের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। মানব-জীবনে ছন্দ বা সুসম্বদ্ধ নীতির প্রতিষ্ঠা করতে হলে তার পক্ষে সত্যের মধ্যে উচ্চতর ছন্দ ও উচ্চতর বিন্যাস স্বীকার করে নিতে হবে। একে মরমী অন্তর্দৃষ্টির অভিজ্ঞতার মাধ্যমে হয়তো জানা যায়। তবে নৈতিক জীবনের সমর্থনের জন্যে তাকে প্রকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

এগুলো ব্যতীত একটা তৃতীয় বিষয়ও রয়েছে—যার ফলে এ ক্ষেত্রে যুক্তির অবতারণার সমর্থন পাওয়া যায়। মরমী অবস্থা অপর

কোনো অবস্থা থেকে তাকে পৃথক করতে পারে না ; কেবলমাত্র বুদ্ধি দ্বারা একটা অবস্থা অপর অবস্থা থেকে পার্থক্য লাভ করে। এ প্রসঙ্গে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে আবিষ্কারগুলো প্রজ্ঞার মাধ্যমে হতে পারে। তবে তাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে বুদ্ধির দ্বারা।”

কনফিউসিয়াস ছিলেন মানুষের নৈতিক জীবনের প্রতি অতিরিক্ত মাত্রায় আগ্রহশীল। তিনি ধর্মের তত্ত্বীয় দিকের প্রতি আগ্রহশীল ছিলেন না। তার সর্বপ্রধান আগ্রহ ছিল ধর্মের নৈতিক দিকের প্রতি। এজন্যে লাওসির মতো তিনি ধর্মের প্রেক্ষাপটে অবস্থিত তিনটে পর্যায় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্যে কোনো আগ্রহ প্রকাশ করেননি। তিনি তার সমাজের লোকদের জন্যে একটা আদর্শিক সমাজ কামনা করেছিলেন। এ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে তিনি সে সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় চারটে ধারণার সাক্ষাৎ পেয়েছেন। এ ধারণাগুলোর কার্যকরী মূল্য রয়েছে। এগুলো হয়তো কনফিউসিয়াস মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টির ফলে আবিষ্কার করেছেন। তিনি এক্ষেত্রে স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে সবগুলো বিশেষ পার্থক্য মুছে ফেলেছেন। তিনি যে সব পদের উল্লেখ করেছেন, তা কোনো স্থানবিশেষের নয়। যে সকল মানুষ সে সকল স্থানে বাস করতো, সে সকল লোকের সম্বন্ধে তাতে উল্লেখ রয়েছে, . . . যে সকল লোক স্বর্গের অধিবাসী তারা হচ্ছেন পূর্বপুরুষগণ (টি)। তারা প্রধান পূর্বপুরুষ দ্বারা শাসিত . . .। এ দুটো ক্ষেত্রের একের সঙ্গে অপরের যোগ রয়েছে, এবং তারা সর্বদাই পরস্পরের

সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এতে স্পষ্টই বুঝা যায়, যে সকল বিষয় তাদের প্রকৃতির দিক থেকে তরীয়, তাদের প্রতি তার কোনো শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি যে ভাষায় স্বর্গ ও পৃথিবীকে বর্ণনা করেছেন তাতে তাকে অভিজ্ঞতাবাদের পূর্বসূরী বলা যায়। অবশ্য তার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে এমন এক প্রত্যয়শীল ব্যক্তি বলে গ্রহণ করা যায়—যিনি এমন কতকগুলো মূল্যমানে বিশ্বাসী ছিলেন—যা মানব-মৃত্যুর পরেও জীবন্ত থাকে।

তাই এ ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই—ধর্মের রাজ্যে যুক্তির প্রাধান্য রয়েছে। তবে তাতে নৈতিক মূল্যমানগুলোকে প্রত্যয় বলে গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্যে কনফিউসিয়াসের ধর্মকে মানুষের নৈতিক চেতনা উন্নয়নের ধর্ম বলা যায়।

ইহুদি, খ্রীষ্টান ও ইসলাম বিশ্বসভ্যতায় সেমেটিক ধর্ম নামে পরিচিত সেমেটিক ধর্মগুলোর মধ্যে ঐতিহাসিক দিক থেকে ইহুদীকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা যায়। এ তিন ধর্মের মধ্যে একটা সাধারণ ঐতিহ্য বর্তমান। এ তিন ধর্মেই এ বিশ্বের স্রষ্টা হিসেবে একজন পরম ব্যক্তিত্বশালী সর্বকর্তৃত্বময় সত্তাকে স্বীকার করা হয়েছে। তিনিই ইহুদীধর্মে জিহোভা, খ্রীষ্টধর্মে গড এবং ইসলাম ধর্মে আল্লাহ নামে পরিচিত। নামের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে গুণের পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। তবে এ পরিবর্তন সত্ত্বেও এ তিনটে ধারণাকে গ্রীকদের নির্বিশেষ ও হিন্দুদের উপনিষদে বর্ণিত পরম ব্রহ্মের ধারণার

বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বলা যায়। কারণ নির্বিশেষ বা পরম ব্রহ্মের মধ্যে ব্যক্তিত্ব নেই। অপরদিকে জিহোভা, গড ও আল্লার মধ্যে ব্যক্তিত্বের চরম অভিব্যক্তি বর্তমান।

ইহুদীধর্মের সর্বপ্রধান বিষয় হচ্ছে অর্থ শব্দের প্রাধান্য। এতে যে অনুসন্ধানের চেষ্টা রয়েছে, তাকে অর্থের অন্বেষা বলা যায়। এজন্যে এতে জিহোভার মধ্যে, স্থষ্টির মধ্যে এবং মানুষের মধ্যে, ইতিহাসের মধ্যে, নৈতিকতার মধ্যে, ন্যায়বিচারের মধ্যে এবং দুঃখকষ্টের মধ্যে অর্থ খুঁজে বের করতে এ ধর্মের রয়েছে লক্ষ্য। এতে যুক্তি হিসেবে বলা হয়েছে—মানুষের যা দর্শন থাক না কেন—তার পক্ষে অন্য সম্বন্ধেও ভাবতে হবে।" তাতে বলা হয়েছে, কোনো মানুষই তাকে তার স্থষ্টিকর্তা বলে ধারণা করে না। সে সকল সময়ই তাকে সীমাবদ্ধ মনে করে। এজন্যেই এ বিশ্বের মূলে একজন স্থষ্টিকর্তা রয়েছেন বলে ধারণা করা হয়। এতে নরাত্মরূপ বা Anthropomorphic ধারণা রয়েছে সত্যি, তবে যেহেতু মানুষের মধ্যে স্থষ্টিকর্তা নেই, এজন্যে বাধ্য হয়েই তাকে এক বিশাল স্থষ্টিকর্তারূপে ধারণা করা হয়েছে। এ স্থষ্টিকর্তার সঙ্গে মরমী উত্তরণের মাধ্যমেই সাক্ষাৎকার সম্ভবপর। সমাজ-জীবনে একটা স্থায়ী সংস্কার ব্যবস্থা করতে হলে, এক্ষেত্রে ভগবানকে সীমার মধ্যে বর্তমানে বিভিন্ন পরিবর্তনের দৃশ্যের মধ্যে পাওয়া যায় বলে ধারণা করা হয়েছে, এজন্য ইতিহাসকে এ পৃথিবীতে ভগবানের নানাবিধ ক্রিয়াশীলতার একটা নাট্যমঞ্চ বলা যায়। তা সত্ত্বেও এ পৃথিবীকে ভগবানের

কৃতকর্মের একটা নাট্যমঞ্চ বলে গণ্য করলেও, এতে সামাজিক ও নৈতিক জীবন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে শুধুমাত্র প্রাতিভাসিক বিষয় বলে গণ্য করার মতো অপবাদ থেকে রক্ষা করা হয়েছে।

এগুলো থেকে আমরা একটা সাধারণ সূত্রে এসে উপস্থিত হতে পারি। আমরা ইহুদীধর্মের দার্শনিক ভিত্তিমূলে মানব-জীবনের বিকাশের মূলে একটা শক্ত ভিত্তি পাই। এ ভিত্তি নৈতিকতা ও ন্যায়ের অর্থ দ্বারা আরো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। দশ মহাদেশ বা (Ten Commandments) পরিষ্কারভাবে বলে দেয়, কিভাবে সে-উদ্দেশ্যগুলো সাধিত হতে পারে। খ্রীষ্টধর্মে এমন কতকগুলো সদুপদেশ (sermon) রয়েছে, যেগুলোকে প্রধানত নৈতিক বলা যায়। উদাহরণস্থলে বলা যায়—'তোমার নিজেদের মতো তোমার প্রতিবেশীকে ভালোবাস, তুমি যেভাবে অপর মানুষের নিকট থেকে কোনো ব্যবহার প্রত্যাশা করো—তুমি সেভাবেই তাদের সঙ্গে ব্যবহার করো। এগুলোকে খুব দৃঢ় সামাজিক একতার জন্যে উপদেশ বলা যায়। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর কাছে যাওয়ার জন্যে আহ্বান এসেছে "আমার কাছে এসো তোমরা যারা পরিশ্রম করে কাতর—আমি তোমাদের বিশ্রাম দেবো—তোমরা সত্যকে জানতে পারবে এবং সত্য তোমাদের মুক্ত করবে।" এক্ষেত্রে যেহেতু নৈতিক বিধানগুলো এমন এক সত্তার নিকট থেকে নির্দেশিত হচ্ছে, যার পক্ষে বিশ্রাম বা শান্তি দেওয়া সম্ভবপর। এতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, একমাত্র সত্যই মানুষকে মুক্ত করতে পারে। কারণ সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়াই

একমাত্র লক্ষ্য এবং সে পথেই যীশুখ্রীষ্ট মানুষকে চালিত করে-ছিলেন। সে কোন্ অপূর্ব মুক্তি—যার পথে তিনি মানবজাতিকে চালনা করেছিলেন? বা স্বকীয় ব্যক্তিকেন্দ্রিক অবধারণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে আহ্বান করেছিলেন? যীশুখ্রীষ্ট সর্বপ্রকার অমঙ্গল থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যে আহ্বান করেছিলেন। মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টির পথে যতগুলো অন্তরায় রয়েছে, সেগুলোকে দূরীভূত করার জন্যেই খ্রীষ্টের আবির্ভাব হয়েছিলো। যারা তাঁর এ আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলো, তারা প্রত্যয়ের দ্বারাই প্রণোদিত হয়েছিলো। তবে এ প্রত্যয়কে পরীক্ষা করারও সুবিধা ছিলো। কারণ স্বয়ং যীশুখ্রীষ্ট তার জন্যে জিম্মা ছিলেন।

ইসলামের মধ্যে আমরা এমন এক একেশ্বরবাদের সন্ধান পাই, যাতে আল্লার ধারণার সঙ্গে কোনো কিছুকেই সমান বলে গ্রহণ করা যায় না। আল্লার কোনো অবতারের ধারণাও ইস্‌লামের কাছে সহনীয় নয়। তাঁর ব্যক্তিগত সত্তায় ও অস্তিত্বের মধ্যে তিনি এক ও অদ্বিতীয়, এবং তাঁর সম্বন্ধে আস্থাবান লোকদের কাছে তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্যে তাঁর পক্ষে কোনো মধ্যবর্তীর প্রয়োজন নেই। ইস্‌লামের কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' হযরত মুহম্মদের (দঃ) কাছে ফেরেশতা জিব্রাইল এনে দিয়েছিলেন। তিনিই তখন এ কর্তব্য সম্পাদনে নিয়োজিত ছিলেন। নবী করিম (দঃ) এ বাণী মানুষের নিকট প্রচার করেন। তবে 'ইলাহ্'র ধারণার মধ্যে দুটো অর্থ রয়েছে, তার এক অর্থ হচ্ছে—তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ উপাস্য এবং সঙ্গে সঙ্গে

বিশ্বের একমাত্র সার্বভৌম শক্তি। আল্লার এ দুটো গুণের বিকাশ মানব-সমাজে দীর্ঘকাল যাবৎ হয়েছে। আমরা ইতিহাসের ধারায় দেখতে পাই—পুরাকালে যে সকল দেবদেবীর ধারণা করা হয়, পরিণামে একত্বের মধ্যে তারা বিলীন হয়ে যায়। এজন্যে ইসলামের মধ্যে একত্ববাদের নীতি সর্বশেষে পূর্ণ পরিণতি লাভ করে, এবং তার সঙ্গে ব্যক্তিত্বের একটা গুণও এসে যুক্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে সার্বভৌমত্বও তার সঙ্গে দেখা দেয়। তার ফলে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে তার প্রভাব পতিত হয়। তাতে স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় যে, মানব-জীবন এমন একটা নীতির অপেক্ষায় ছিলো—যাকে গ্রহণ করলে তার জীবনের সকল দিকের সন্তোষ বিধান হয়। আল্লার রয়েছে নিরানব্বই নাম। এগুলো একদিকে আল্লার গুণাবলী হিসেবে দুনিয়ায় প্রতিভাত। তা সত্ত্বেও তারা চিন্তার কতকগুলো মাধ্যমও বটে। তাদের দ্বারা আল্লাহ সম্বন্ধেও জ্ঞানলাভ করা যায়। সুতরাং আমরা এক বা একই ধারণার সংস্পর্শে এসে উপস্থিত হই—মানব-জীবনের উপর যার সরাসরি প্রভাব রয়েছে। এ সকল ধারণা থেকে যে সকল চিন্তার অনুকরণ হয়, তা থেকে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি, এ ধারণা থেকেই মানব-জীবনের সকল দিকেরই সন্তোষ লাভ হয়। মানব-জীবনের একান্ত কামনা হচ্ছে—একটিমাত্র নীতি থেকে তার সকল দিকের পূর্ণ সন্তোষ লাভ।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টই বুঝা যায়, সকল ধর্মের মধ্যেই প্রত্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে যুক্তিরও অবতারণা করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে

এ বিষয়টাও স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, প্রত্যেক ধর্মের মধ্যেই একটা তাত্ত্বিক দিক রয়েছে। বৈদান্তিক হিন্দুধর্মের পরম ব্রহ্ম, শাক্তদের চণ্ডী, বৈষ্ণব-দের বিষ্ণু, শৈবদের শিবকে এ বিশ্বচরাচরের মূলে অবস্থিত আদিসত্তা বলে গ্রহণ করেছিলো—মানুষ তাদের সঙ্গে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়ে অমরত্ব লাভ করতে চায়। বৌদ্ধধর্মে আদিসত্তা সম্বন্ধে কোনো পরিষ্কার উক্তি না থাকলেও তার অন্তর্গত নির্বাণের ধারণার মধ্যে মানব-জীবনের চরম পরাকাষ্ঠা বর্তমান বলে—তাতেও অমরত্ব লাভের একস্থল বলা যায়। কারণ যেহেতু নির্বাণের পরে জন্ম বা মৃত্যুর কোনো আশঙ্কাই নেই, এ জন্য সে পর্যায়ে মানব-জীবনের আর কোনো পরিবর্তন নেই বলে—তাকে একটা স্থিতিশীল পর্যায় বলা যায়।

টায়োর মতবাদ অনুসারে মানুষ উচ্চতর ছন্দ ও উচ্চতর নীতিকে তার জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে—সত্যের মধ্যেও উচ্চতর নীতি ও বিন্যাস স্বীকার করে নিতে হবে। একে মরমী অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে হয়তো জানা যায়, তবে তাকে নৈতিক জীবনের সমর্থনের জন্যে প্রকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, নৈতিক জীবন তথা উন্নততর জীবনের জন্যে একটা স্থিতির প্রয়োজন। সে স্থিতির প্রয়োজনীয়তাকে একটা আশ্রয় বলে গণ্য করা যায়। এ আশ্রয়ই হচ্ছে মানব-জীবনের সে অমরত্ব লাভের পক্ষে প্রয়োজনীয় কনফিউসিয়াসের সর্বপ্রধান কামনা ছিলো মানুষের জন্যে একটা আদর্শিক সংস্থার সন্ধান করা। তবে তিনি এমন কতক-

গুলো মূল্যমানে বিশ্বাসী ছিলেন,—যা মানব-মৃত্যুর পরেও জীবন্ত থাকে। এ মূল্যমানের প্রতি প্রত্যয় থাকার ফলে তাকে অমরত্ব লাভের জন্যে প্রত্যাশী বলা যায়। অপরদিকে তিনি স্বর্গ ও মর্ত্য বলতে কোনো বিশিষ্ট স্থানকে নির্দেশ করেন নি। স্বর্গ বলতে তিনি পূর্বপুরুষকে নির্দেশ করেছেন। স্বর্গ যখন সব সময়ই মর্তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, এজন্যে সে পূর্বপুরুষগণ সব সময়ই অমর। এতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, অমরত্বের ধারণা কনফিউসিয়াসের মধ্যে ছিলো এবং সে-অমরত্বকে উচ্চস্তরে অবস্থিত বলে তিনি ধারণা করতেন।

সেমেটিক ধর্মগুলোর মধ্যে ইহুদিদের ধর্মে এ বিশ্বকে জিহোভার একটা নাট্যমঞ্চ বলে ধারণা করা হয়েছে। সামাজিক ও নৈতিক জীবন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে শুধুমাত্র প্রাতিভাসিক বলে ধারণা করেছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমাজে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা। সমাজে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা না হলে, মানুষের পক্ষে এ পৃথিবীর বুকে টিকে থাকার কোনো সম্ভাবনা নেই। এজন্যে আত্মরক্ষার (self protection) জন্যে তার একান্ত প্রয়োজন। অপরদিকে জিহোভার সঙ্গে মরমী উত্তরণের মাধ্যমেও মিলন সম্ভবপর। মানব-জীবনে একটা স্থায়ী সংস্থার ব্যবস্থা করতে হলে, এ ক্ষেত্রে জিহোভাকে পৃথিবীর সীমার মধ্যে বর্তমান বিভিন্ন পরিবর্তনের দৃশ্যের মধ্যে পাওয়া যায়। এজন্যে ইতিহাসকে এ পৃথিবীতে ভগবানের নানাবিধ ক্রিয়াশীলতার একটা নাট্যমঞ্চ বলা যায়। এসব উক্তি থেকে স্পষ্টই বুঝা যায়, এ নাট্যমঞ্চের অন্তরালে যিনি বিরাজ করেন, তার সঙ্গে

মরমী উত্তরণের প্রয়োজন হচ্ছে, স্থায়ীভাবে টিকে থাকা বা self-perpetuation-এর জন্যে।

খ্রীষ্টধর্মে যীশু সর্বপ্রকার অমঙ্গল থেকে মুক্তি দেবার জন্যে মানবজাতিকে আহ্বান করেছিলেন। স্বকীয় ব্যক্তিকেন্দ্রিক অবধারণ বা Egocentric predicament থেকে মানুষকে মুক্ত করতে তিনি চেয়েছিলেন। এ মুক্তি সাধিত হলে মানুষের পক্ষে আর বাসনার দাস হয়ে থাকা সম্ভবপর হয় না। তখন এ বিশাল বিশ্বের সব কিছুই তার কুটুম্ব হয়ে দেখা দেয়। তাতে সে তার এ সীমাবদ্ধ চেতনা থেকে মুক্তিলাভ করে, বৃহত্তর চেতনার মধ্যে অমরত্ব লাভ করে। আল্লার একত্ব, চিরন্তনত্ব, সার্বভৌমত্ব ও মহাশক্তির ধারণা থেকেও মানবজীবনের চরম পরিণতি সম্বন্ধে আরো নানাবিধ ধারণার উৎপত্তি সম্ভবপর। আল্লাহ চিরন্তন হলে—তারই একগুণের স্থষ্টি মানুষও চিরন্তন হতে বাধ্য। এ পৃথিবীতে বা স্থষ্টিতে আল্লারই একমাত্র অস্তিত্ব বর্তমান বলে—এ স্থষ্টি তথা মানুষের কোনো ধ্বংস নেই।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বুঝতে পারি, কোনো ধর্মের উৎপত্তির মূলেই বিশুদ্ধ যুক্তি নেই। এ দুনিয়ার সকল ধর্মই অল্পাধিক প্রত্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে ধর্মের মূলনীতির প্রতিষ্ঠার পরে—তাকে যুক্তির দ্বারা দৃঢ়তর করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাই এক্ষেত্রে আমরা মহামতি লেভ তলস্তয়ের উক্তির প্রমাণ পাই। তিনি বলেছিলেন—"ধর্মের উৎপত্তি অনুভূতি বা feeling থেকে।

তার প্রতিষ্ঠা হয় যুক্তি দ্বারা এবং তাকে প্রচার করার জন্যে নানাবিধ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।" তবে সকল ধর্মের মধ্যেই মানুষের অমরত্ব লাভের সে আদিম বাসনা কোথাও বা বাহ্য, আবার কোথাও বা উহ্য হয়ে রয়েছে। মানুষ এ বিশ্বচরাচর বা স্থিতিতে চিরন্তন হয়ে টিকে থাকতে চায় বলেই, সে ধর্মীয় স্বজ্ঞা বা প্রত্যয়ের মাধ্যমে সে চিরন্তন আদিসত্তাকে পেতে চায়। তার সঙ্গে মিলিত হয়ে যাতে সর্বপ্রকার ক্ষয়ক্ষতির ঊর্ধ্বে সে স্থিতিশীল থাকতে পারে এ-ই হচ্ছে তার জীবনের সর্বপ্রধান কাম্য।

ধর্মজগতে বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগ

ইতিপূর্বে আমরা প্রত্যয় ও যুক্তির তুলনামূলক আলোচনা করে দেখতে পেয়েছি, উভয়ের মধ্যেই অল্পবিস্তর প্রত্যয় রয়েছে এবং উভয়ের মধ্যে যুক্তিরও ক্রিয়াশীলতা বর্তমান। গোড়াতে জীবন-সমস্যার নানাবিধ সমাধানের জন্যে উভয়েরই উৎপত্তি হলেও উভয়ের গতিধারার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

উভয়ের মধ্যে অপর এক জায়গায় রয়েছে পার্থক্য- কোনো ধর্মই যুক্তির মাধ্যমে এ জগতে আবির্ভূত হয় নি। কোনো ক্ষেত্রে আলোকিত অবস্থার মাধ্যমে, কোথাও বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে, কোথাও বা আকাশে ভাসমান সত্য হিসেবে ধর্মের মূলনীতিগুলো প্রকাশিত হয়েছে। গোড়াতে ধর্মীয় নেতার মধ্যে যেমন এ পৃথিবীর নানাবিধ দৃশ্যাবলীকে সন্দেহের চোখে দেখার প্রবণতা দেখা দেয়, তেমনি এ জগতে যারা দর্শনের নানাবিধ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন তাদের মানসেও সন্দেহের উৎপত্তি হয়েছে। সন্দেহের উৎপত্তি না হলে, তারা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হতেন না। এজন্যে সকল ধর্মের প্রর্বতককেই প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার বা প্রচলিত প্রত্যয়ের প্রতি সন্দেহের ভাব পোষণ করে সত্যের

আবিষ্কারের জন্যে সাধনা করতে দেখা যায়। পার্থক্য শুধু এখানেই রয়েছে, জগতে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হলে—তার প্রতি আস্থাবান মানুষেরা—তার সত্যতা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করে না। অপরদিকে দার্শনিক জগতে যারা সত্যের অন্বেষা করেন তারা তাদের পূর্ববর্তী কারো মতবাদকে নিখুঁত সত্য বলে গ্রহণ করেন না। তাদের মধ্যে অপর এক জায়গায়ও পার্থক্য রয়েছে। ধর্মীয় প্রত্যয়ের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যে-কোনো বিশিষ্ট ধর্মের মধ্যে নানাবিধ শাখা দেখা দেয়। তবে তা সে বিশিষ্ট ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে পড়ে না। তারই বিশিষ্ট রূপ বলে পরিগণিত হয়। অপরদিকে কোনো দার্শনিক মতবাদ তার পূর্ব-বর্তী মতবাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে এমন নূতন রূপে দেখা দিতে পারে যে, তখন তাকে আর সে পূর্ববর্তী মতবাদের বিশিষ্ট রূপ বলা যায় না—সে সম্পূর্ণভাবে এক নূতন রূপেই দেখা দেয়। এজন্যে ধর্মের ক্ষেত্রে যতগুলো ভাষ্য দেখা দেয়, দর্শনের ক্ষেত্রে এতগুলো ভাষ্য দেখা দেয় না—সেগুলো এক একটা অভিনব মতবাদরূপেই দেখা দেয়। তবে দার্শনিক মতবাদ থেকেও ধর্মের উৎপত্তি হতে পারে—যদি তাতে তর্ক বুদ্ধি, বা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের ধারা পরিত্যাগ করে সংজ্ঞার মাধ্যমে দার্শনিক তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে। ইতিহাসে তার দৃষ্টান্তও রয়েছে। প্লটিনাস প্লেটোর দার্শনিক মতবাদকে স্বজ্ঞার মাধ্যমে ধর্মীয় মতবাদে পরিণত করেছিলেন। অপরদিকে, মূলত অমরত্ব-লাভের জন্যে একটা আশ্রয়ের অন্বেষণে মানব-মানস ধর্মীয় বা তাত্ত্বিক নীতির অন্বেষণে প্রবৃত্ত হলেও, দর্শনের ক্ষেত্রে মানব-মানসে—যেভাবে বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের চিন্তা ব্যতীত জ্ঞানের মাধ্যম ও তার স্থান, দর্শনের সঙ্গে

সাহিত্যের সম্বন্ধ, ইচ্ছার স্বাধীনতা বা স্বাধীনতা সম্বন্ধে যেসব প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে—ধর্মের ক্ষেত্রে সেরূপ প্রশ্ন তত প্রবলভাবে দেখা দেয় নি। কাজেই ধর্ম ও দর্শনের পারস্পরিক ঐক্য ও অনৈক্যের তুলনা-মূলক আলোচনা করতে হলে—দার্শনিক জগতে জ্ঞানের অন্যান্য বিষয় নিয়ে যে সব আলোচনা হয়েছে সে সম্বন্ধেও আমাদের অবহিত হতে হবে। তেমনি ধর্মের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক গবেষণার তুলনামূলক আলোচনা করতে হবে। এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঙ্গে ধর্মের ও দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা হওয়া প্রয়োজনীয়।

আমরা পূর্বেই দেখতে পেয়েছি, ধর্মীয় সত্যগুলো বুদ্ধির দ্বারা আহ-রিত হয় নি। তবে বুদ্ধি দ্বারা তারা মানব-জীবনে প্রতিষ্ঠিত না হলেও বুদ্ধির কার্যকারিতা তাতে দেখা দেয়। কারণ মানব-মানস এক ও অখণ্ড গতিকে তার মধ্যে একটা দিকের কার্যকারিতার ফল অপরদিকে পতিত হয়। যেহেতু বুদ্ধির দৌলতেই মানুষ জীবনযুদ্ধে এত অসম্ভাবিত সাফল্য লাভ করেছে, এজন্যে বুদ্ধি তার জীবনে দেখা দিয়েছে এক অমোঘ অস্ত্র হিসেবে। জীবনের নানা ক্ষেত্রে আহরিত জ্ঞানকে মানুষ বুদ্ধির মাধ্যমেই যাচাই করে।

প্রশ্ন হচ্ছে এক্ষেত্রে বুদ্ধির প্রয়োগ কিভাবে হতে পারে? ধর্মজগতে আহরিত জ্ঞানকে মানুষ অবরোহ পদ্ধতির (deductive method) মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে, না আরোহ পদ্ধতির দ্বারা পরীক্ষা করে দেখবে? এতদিন পর্যন্ত ধর্মীয় সত্যগুলোকে মানুষ অবরোহ

পদ্ধতির দ্বারা পরীক্ষা করেছে। সমগ্র মধ্যযুগে এবং বর্তমানকালেও ধর্মীয় সত্যগুলোকে অবরোহ পদ্ধতির দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছে। ধর্মের মূল বিষয়কে অভ্রান্ত সত্য বলে গ্রহণ করে, তা থেকে অবরোহ পদ্ধতির মাধ্যমে যেসব পরিণতি টেনে নেয়া যায়, তাদেরও অভ্রান্ত বলে স্বীকার করা হয়। এ পদ্ধতির সূচনা হয়েছে গ্রীক দর্শনের ধ্বংসের সময়— প্লটিনাসের দ্বারা। তিনি প্লেটোর দর্শনকে এ পদ্ধতির মাধ্যমেই মরমীবাদী ধর্মে পরিণত করেছিলেন। প্লেটোর মঙ্গলের ধারণাকে (Idea of the good)-কে তিনি আদিসত্তা বা God-এ রূপান্তরিত করেন। এবং তা থেকে উৎসারণের ধারায় কিভাবে এজগতেও মানবাত্মার উৎপত্তি হয় —তা প্রদর্শন করেন। তার পরে সমগ্র মধ্যযুগে খ্রীষ্টান ও মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদগণ সেই একই পদ্ধতি গ্রহণ করে কিভাবে আদিসত্তা থেকে এ বিশ্ব-চরাচর বা মানবাত্মার উৎপত্তি হয়েছে তা প্রদর্শন করেছেন। তার পরে সমগ্র মধ্যযুগে খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্মতত্ত্ববিদগণ সেই একই পদ্ধতি অবলম্বন করে। কিভাবে আদিসত্তা থেকে এ বিশ্ব-চরাচর বা মানবাত্মার উৎপত্তি হয় তা প্রদর্শন করেছেন।

এতে একদিকে মানব-মানসকে যেমন বন্দী করা হয়েছে, তেমনি অপরদিকে ধর্মের পরিধিকেও অত্যন্ত সীমিত করা হয়েছে। এ ধারার প্রবর্তনে স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় ধর্মজগতে প্রশ্ন উত্থাপনের কোনো স্থান নেই। এক্ষেত্রে প্রদত্ত বাণীকে গ্রহণ করে—তারই অন্তর্গত বিষয়-বস্তুকে বিচার করার জন্যে বুদ্ধির কার্যকারিতা রয়েছে। মূল

সত্যকে নিয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা বুদ্ধির পক্ষে মোটেই উচিত নয়। এতে প্রকারান্তরে বলা হয়, মানুষের পক্ষে প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে অন্ধবিশ্বাসী হয়ে থাকতে হবে। তবে সে প্রত্যয়ের মধ্যে স্থিত নানাবিধ তত্ত্ব ও তথ্য সম্বন্ধে বিচার করা মানুষের পক্ষে সম্ভব এবং এতে মানুষের অধিকারও রয়েছে।

এ নির্দেশের বিরুদ্ধে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপে রেনেসাঁ আন্দোলন দেখা দিয়েছে। তবে পরবর্তীকালে এ আন্দোলন তার লক্ষ্যকে টিকিয়ে রাখতে পারে নি। ষোড়শ শতাব্দীতে তা ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনে পরিণত হয়। সে আন্দোলনের জের এখনো চলছে।

এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, ধর্মের পরীক্ষা-নিরীক্ষা কি শুধু অবরোহ পদ্ধতির মাধ্যমেই সীমাবদ্ধ থাকবে। ধর্মের রাজ্যে আরোহ পদ্ধতির প্রয়োগ কি চিরকালের জন্যেই নিষিদ্ধ থাকবে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, মানব-জীবনের নানাবিধ প্রশ্ন থেকেই ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। এ সকল প্রশ্নের মীমাংসা বিভিন্ন ধর্মে করা হয়েছে। এজন্যে প্রত্যেকটি ধর্মকে এক একটা প্রকল্প বা hypothesis বলা হয়। সে প্রকল্পগুলোর উৎপত্তি আরোহ পদ্ধতিতেই হয়। জীবন-জিজ্ঞাসার নানাবিধ উত্তরদানকল্পে এসব প্রকল্পের উৎপত্তি হয়। সেসব প্রকল্প কোথাও বা অহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত, কোনো ক্ষেত্রে বা নিধিধ্যানের মাধ্যমে প্রাপ্ত হতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে

আলোকিত অবস্থার মাধ্যমে হতে পারে। তবে তাদের মূল লক্ষ্য যে জীবনের নানাবিধ প্রশ্ন বা সমস্যার সমাধান, সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কাজেই ধর্মের রাজ্যেও প্রত্যক্ষে না হোক পরোক্ষে প্রকল্পের প্রয়োগ হয়—একথাটা অস্বীকার করার উপায় নেই।

প্রশ্ন হচ্ছে যদি এগুলোকে প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করা যায়, তা হলে বৈজ্ঞানিক জগতের প্রকল্পের সঙ্গে তাদের পার্থক্য কোথায়? এবং তাদের সত্যাসত্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার উপায় কি? সে সম্বন্ধেও আলোচনার প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক জগতে কতকগুলো তথ্য বা data গবেষকের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। সেগুলোকে নানাভাবে পরীক্ষণের দ্বারা—তাদের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ বের করা হয় এবং পরে সেগুলোর ভিত্তিতে একটা প্রকল্প বা Hypothesis গঠন করা হয়। সে প্রকল্প থেকে যে নানাবিধ পরিণতি দেখা দেয় – তাদের দ্বারাই সে প্রকল্পগুলোর সত্যাসত্য নির্ধারণ করা হয়। উদাহরণস্থলে বলা যায়, নিউটন যখন একটা ফলকে মাটির দিকে দ্রুতগতিতে ধাবমান হয়ে পতিত হতে দেখতে পান, তখন সে দৃশ্যটা তাঁর কাছে ছিলো তথ্য। এ দৃশ্যের ভিত্তিতে তিনি মাধ্যাকর্ষণ নীতির সূত্র আবিষ্কার করেন। পরে এ প্রকল্পের সত্যাসত্য নির্ধারণের জন্যে তিনি তা থেকে কতকগুলো ফল বা পরিণতিকে তার বিচারের সূত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। যদি এ আকর্ষণ সত্য হয়--তা হলে এ পৃথিবী চন্দ্র নামক তার এক উপগ্রহকে তার দিকে আকর্ষণ করবে। চন্দ্র তার কক্ষ থেকে বিচ্যুত হয়ে আসতে পারবে না। এজন্যে তাকে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে

ঘুরতেই হবে। সে ঘূর্ণনের মেয়াদ হবে ঊনত্রিশ দিন। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেলো--চন্দ্র দিনে একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। এতে তার পূর্বগঠিত প্রকল্প সত্য বলে প্রমাণিত হয়। ধর্মীয় তথ্য থেকে এ জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে যে তত্ত্ব পাওয়া যায়, তাকে বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের মতোই জ্ঞান করা যায় কিনা এবং তাদের সত্যাসত্যের বিচার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হতে পারে কিনা ? প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় প্রকল্প কোনো জাগতিক উদাহরণের দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে না। জিহোভা, গড, অথবা আল্লাহকে মাধ্যাকর্ষণ সংক্রান্ত কোনো প্রকল্পের মতো গণ্য করে তাদের প্রমাণ করা যাবে না। কারণ তারা আধ্যাত্মিক জগতের বিষয় বলে কোনো জড়, ধাতব বা বৈদ্যুতিক বিষয় নন। তাদের অস্তিত্ব মানব-চক্ষুর দ্বারা আবিষ্কার করা সম্ভবপর নয়। তবে তাদের দ্বারা মানবজীবনের নানাবিধ সমস্যার সমাধান হয়। তাদের সার্থকতা রয়েছে—মানবজীবনে বিরাজমান নানাবিধ চিরন্তন প্রশ্নের মীমাংসার সার্থকতায়। তাদের এ মীমাংসার সঙ্গে জড়িত নানাবিধ নৈতিক মূল্যমান রয়েছে বলে তাদের সাধারণ বা বৈজ্ঞানিক শ্রেণীর প্রকল্প থেকে উচচ পর্যায়ের বলে ধারণা করা উচিত। তাদের শুধুমাত্র প্রকল্প না বলে পবিত্র প্রকল্প বা Holy hypothesis বলা উচিত।

মানব-জীবনের যেসব চিরন্তন জিজ্ঞাসা বা সমস্যার সমাধানকল্পে এসব পবিত্র প্রকল্প গঠিত হয়, সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আমাদের মানসে বাসনা (urge) রয়েছে বলেই, তাদের উৎপত্তি সম্ভবপর হয়। এক্ষেত্রে আরো একটা স্বতঃসিদ্ধকে অভ্রান্ত বলে গ্রহণ

করা যায়। বার্নার্ড বোসানকের ভাষায় **The hunger proves the existence of food**—অর্থাৎ ক্ষুধা আছে বলেই প্রমাণিত হয়, ক্ষুধার তৃপ্তির জন্যে খাদ্য রয়েছে। ধর্মজগতের প্রকল্পগুলো তাই আমাদের সহজাত বাসনারই অবধারিত ফল।

দর্শনের মূল লক্ষ্য

দার্শনিক সাহিত্যের আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায়—প্রাথমিক পর্যায়ে বুদ্ধিকেই জ্ঞানের একমাত্র মাধ্যম বলে গ্রহণ করে সত্যের অন্বেষণ এবং তা থেকে পাঠ গ্রহণই ছিলো দর্শনের লক্ষ্য। এক্ষেত্রে বুদ্ধি বা **Intellect** বলতে পঞ্চেন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা এবং যুক্তিতে কার্যকরী বিষয়কেই গ্রহণ করা হচ্ছে। সে বুদ্ধির মাধ্যমেই মূল বিষয় বা তত্ত্বকে জানার প্রচেষ্টা থেকেই দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি। তারই পরিণতিতে কেউ বা মূল বিষয়কে অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় বলে ঘোষণা করেছেন। আবার কেউ তাকে আদিসত্তা, পরম ব্রহ্মা, চেতনাময় ইত্যাদি নানাভাবে আখ্যায়িত করেছেন। তবে এক্ষেত্রে গোড়াতে একটা বিষয়কে স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বুদ্ধিই যে জ্ঞানের একমাত্র মাধ্যম তা কেউ প্রমাণ করেন নি। এজন্যে একে একটা পরিচ্ছন্ন গোঁড়া মতবাদ (Dogmatism) বলে আখ্যায়িত করা যায়। যদিও বুদ্ধিকে একমাত্র জ্ঞানের মাধ্যম বলে গ্রহণ করা যায়, তাহলেও তাকে মানবজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো মতবাদ বলা যায় না। তার উপর আমাদের নিকট যা অকাট্য সত্য বলে পরিচিত তা হচ্ছে-- বুদ্ধি হচ্ছে জীবনযুদ্ধে ব্যবহারের জন্যে একটা অমোঘ অস্ত্র।
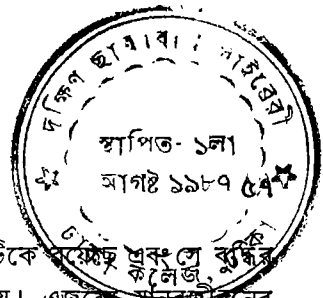
বুদ্ধির দৌলতেই মানুষ এ জীবন-সংগ্রামে টিকে রয়েছে এবং সে বুদ্ধির মাধ্যমেই সে অমর হয়ে টিকে থাকতে চায়। এজন্যে মানবজীবনের পক্ষে আত্মসংরক্ষণ (self-protection) এবং চিরস্থায়ীভাবে আত্ম-প্রতিষ্ঠার (self-perpetuation) জন্যে বুদ্ধির ব্যবহার অপরিহার্য। তবে এক্ষেত্রে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, যা এক সময় ছিলো আত্মরক্ষা বা আত্মপ্রতিষ্ঠার উপায় মাত্র, তা-ই এখন লক্ষ্য হিসেবে গৃহীত হয়েছে। সত্যের অন্বেষায় দীর্ঘকাল বুদ্ধির ব্যবহারকে কেউই অস্বীকার করতে পারে না। সক্রেটীস, প্লেটো ও এ্যারিষ্টটল বুদ্ধিকেই সত্যলাভের মাধ্যম বলে গ্রহণ করেছেন। এ বুদ্ধির মাধ্যমেই সক্রেটীস সোফিষ্টগণকে পরাজিত করেছেন। তার ফলে তার শিষ্য প্লেটো এবং প্রশিষ্য এ্যারিস্টটল—উভয়েই বুদ্ধিকে জ্ঞানলাভের সর্বোচ্চ মাধ্যম হিসেবে গণ্য করে, ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে নিম্নস্তরে স্থাপন করেছেন। এতে যে বুদ্ধির প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে তাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টায় প্লেটো ইন্দ্রিয়জ বা জ্ঞানের অসারতা প্রদর্শন করেছেন। কারণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে সব বিষয় আমাদের কাছে উপস্থাপিত হয়, তারা নিতান্তই ক্ষণিক, এজন্যে তাদের কোনো মূল্য নেই। কাজেই যে ইন্দ্রিয় এসব ক্ষণিক বিষয় আমাদের কাছে উপস্থাপন করে তার মূল্যও বিশেষ কিছু নয়। এক্ষেত্রে যদি হিরাক্লিয়াটের ধারণার বশবর্তী হয়ে কেউ আপত্তি উত্থাপন করে বলে যে, এ বিশ্বের মূলে রয়েছে এক অনিবার্য পরিবর্তনশীলতা। এ বিশ্বের প্রত্যেকটি বিষয়েই অবিরাম পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, তা হলে ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রতিভাত জগৎকে অস্বীকার করার মূলে কোনো

যুক্তি বর্তমান, তা হলে প্লেটো কোনো সুসঙ্গত উত্তর দিতে পারতেন না। যদিও এ প্রসঙ্গে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কোনো উত্তর দেন নি—তবুও তার ভাবে ও ভাষায় বুঝা যায়—তিনি স্থায়িত্বকে গারমাইডিসের মতো পরিবর্তনের চেয়ে অধিকতর স্থায়ী বিষয় বলে গণ্য করেছেন, এক্ষেত্রে তার এ-ভাবকে প্রত্যয় বলেই গণ্য করতে হবে। এ প্রত্যয়ের উপরই তার এত বড় দার্শনিক সৌধ স্থিতিশীল।

যদিও এ্যারিষ্টটল ইন্দ্রিয় চেতনার প্রতি অধিকতর সদয় ছিলেন, তা সত্ত্বে তিনি যুক্তির মায়াজালের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেননি। যদিও তিনি আকার ও জড়পদার্থকে বিচ্ছিন্ন করতে মোটেই সম্মত ছিলেন না, তা সত্ত্বেও তিনি জড় থেকে আকারকেই উচচতর পর্যায়ের বলে ধারণা করেছিলেন। কারণ তাঁর মতবাদ অনুসারে আকারগুলো দ্বারা জড়পদার্থ পরিচালিত হয়। আকারের সঙ্গেই যুক্তির রয়েছে অধিকতর সম্বন্ধ—আকারই জড়কে সংস্থা দান করতে পারে এবং উপরের স্তরে উত্তোলন করতে পারে। জড়ের দ্বারা আকারের মধ্যে কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় না। এতে এ্যারিষ্টটলের মানসেও যুক্তির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

আধুনিক দর্শনের জনক ডেকার্থে প্রাথমিক পর্যায়ে ইন্দ্রিয়জ সত্যের সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করেছেন। এজন্যে তাদের দ্বারা পরিবেশিত জ্ঞানের সত্যতাকে অস্বীকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে তার মানসে

যে সত্যের অপর কোনো মানদণ্ড কার্যকরী ছিলো—সে সম্বন্ধে আমরা স্থির নিশ্চিত। তবে এ সম্বন্ধে কোনো প্রমাণ পেশ করা সম্ভবপর নয়। একে নিছক একটা প্রত্যয়ই বলতে হবে। ঈশ্বর, বহির্বিশ্ব এবং জীবাত্মা—এ তিনটি বস্তুকে তিনি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন প্রত্যক্ষণের দ্বারা জানতে পেরেছিলেন—এজন্যে এ তিনটি বিষয়কে তিনি সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। এতে মনে হয় পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন প্রত্যক্ষণকেই তিনি সত্যলাভের মানদণ্ড বলে গ্রহণ করেছিলেন। এজন্যে যদিও তিনি মধ্যযুগীয় গোঁড়া মতবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন, তা সত্ত্বেও প্রত্যয়ের প্রভাব থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেন নি। 'চিন্তা করি বলেই আমি আছি'—এ নীতির আবিষ্কারের সূচনায় এবং ঈশ্বর, বহির্বিশ্ব বা আত্মা সম্বন্ধে দার্শনিক মতবাদের প্রতিষ্ঠায় তার মানসে সে নীতি ক্রিয়াশীল ছিলো।

স্পিনোজা তার পূর্ববর্তী দার্শনিক ডেকার্তের মতবাদকে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ করা'র চেষ্টা করে তার মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তার মানসে যে নীতি ক্রিয়াশীল তা হচ্ছে : 'সারবস্তুকে স্বনির্ভর হতে হবে'। যা স্বনির্ভর নয়, তা সারবস্তু হতে পারে না। এ ধারণার মূলে কোনো জোরালো যুক্তি নেই। এটা নিছক একটা প্রত্যয়। কারণ এ পৃথিবীতে যত বিষয় রয়েছে তারা একে-অপরের সঙ্গে নানাবিধ সম্বন্ধে আবদ্ধ। এজন্যে তারা স্বনির্ভর নয়। তাই সারবস্তুকে এ বিশ্বের আদিসত্তা বলে গ্রহণ করতে হলে, তা

প্রত্যয়ের মাধ্যমেই করতে হবে। কাজেই স্পিনোজার সারসত্তা বা Substance-কে এক প্রত্যয়জাত বস্তু বলেই গ্রহণ করতে হয়।

লেইরনিট্জ স্পিনোজার অনুসরণ করে—তার বক্তব্যকে সংশোধিত আকারে প্রকাশ করেছেন। স্পিনোজার এক বস্তুর পরিবর্তে তিনি অসংখ্য ও অনন্ত বস্তুর প্রতিষ্ঠা করে, উহাদের সয়গুলোকেই একই গুণের অধিকারী বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। স্পিনোজার কাছে বস্তুর সংখ্যা ছিলো এক, অপরদিকে গুণের সংখ্যা ছিলো বহু, লেইবনিট্জের কাছে বস্তুর সংখ্যা বহু তবে গুণের সংখ্যা এক। তবে স্পিনোজা বা লেইরনিট্জ বস্তুর স্বনির্ভরতার পক্ষে এমন কোনো দৃঢ় প্রমাণ পেশ করতে পারেন নি। লেইরনিট্জ অবশ্য একটা প্রায়োগিক প্রমাণ পেশ করেছেন, তবে যেহেতু প্রায়োগিক প্রমাণের সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না – এজন্যে তাকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত বলা যায় না। এজন্যে আমাদের বাধ্য হয়েই স্বীকার করতে হবে, যেসব ক্ষেত্রে এ বিশ্বের আদিসত্তা সম্বন্ধে কোনো প্রকল্পের প্রতিষ্ঠা হয়েছে সেক্ষেত্রে প্রত্যক্ষে না হোক পরোক্ষে একটা প্রত্যয় রয়েছে। সে প্রত্যয় রয়েছে একদিকে আমাদের বুদ্ধির উপর, না হয় গঠিত প্রকল্পের বাস্তবতার উপর।

লক, বার্কলি ও হিউম তিনজনেই ছিলেন অভিজ্ঞতাবাদী। তাতে তাদের তিনজনকেই প্রত্যয়শীলতা থেকে মুক্ত মনে করার সঙ্গত কারণ রয়েছে। তারা তিনজনেই অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণে ছিলেন

রত। তবে সারবস্তুর ধারণা প্রসঙ্গে লক তার পূর্ববর্তী দার্শনিকদের মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করেন নি। তিনিও তাঁদের মতোই সারবস্তুকে স্বাশ্রয়ী ও স্বনির্ভর বলে ধারণা করেছেন। এ ধারণা কিন্তু ইন্দ্রিয় দ্বারা পরিজ্ঞাত নয়। এজন্যে বার্কলির পক্ষে এরূপ ধারণাকে অস্বীকার করা সম্ভবপর ছিলো। তবে তিনি তাঁর স্বকীয় ন্যায়শাস্ত্রের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে এ জগতের স্থায়িত্ব রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন। তার পরবর্তী চিন্তানায়ক হিউম যদিও বার্কলির ধারণাগুলোর মধ্যে এমন কোনো প্রতিশ্রুতি পান নি, যাতে তাদেরই আদিসত্তা বলা যায় -তা সত্ত্বেও তিনি তার ইন্দ্রিয়গুলোর উপর অতিরিক্ত মাত্রায় আস্থাশীল ছিলেন বলে, তার মধ্যেও এক অতিরিক্ত প্রত্যয়শীলতা দেখা দিয়েছিলো। এজন্যে ক্যাণ্টের পক্ষে যুক্তিবাদী বা ভাববাদী কারো মতবাদ এত সহজে গ্রহণ করা সম্ভবপর ছিলো না। তিনি এ উভয় দলকেই তাদের যথাযথ স্থান দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তার মতবাদ অনুসারে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো থেকে কতকগুলো সংবেদন লাভ করি। এগুলোকে আমাদের মানসে অবস্থিত কতকগুলো অভিজ্ঞতাপূর্ব আকার, চিন্তা, ও ধারণা দ্বারা সুসংবদ্ধ করে আমরা জ্ঞানের সৌধ গড়ে তুলি। তবে তত্ত্বীয় যুক্তির ক্ষেত্র থেকে যখন তিনি কার্যকরী যুক্তির পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন, তখন তাতে তিনি একটা স্বনির্ভরতার সাক্ষাৎ পেয়েছেন এবং তাতে ইচ্ছার স্বাধীনতার সন্ধান পেয়েছেন। তার ফলে আত্মার অমরত্ব এবং ভগবানের অস্তিত্বের স্বপক্ষেও যুক্তির অবতারণা সহজ হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে প্রশ্ন হচ্ছে, নৈতিক যুক্তির সার্বভৌমত্ব কিসে প্রতিষ্ঠিত

হতে পারে? তা থেকে আত্মার অমরত্ব এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বই বা কিসে প্রমাণিত হতে পারে? এ নৈতিক সার্বভৌমত্বের সঙ্গে প্রত্যয়ের বা যুক্তির কোন্‌টার নিকট-সম্বন্ধ বর্তমান? এ প্রশ্নের মীমাংসা ক্যাণ্ট করেন নি।

ক্যাণ্ট পরবর্তীকালে দর্শনের ক্ষেত্রে ফিক্‌টে নৈতিক যুক্তিকেই প্রাধান্য দান করেছেন এবং এ প্রত্যয়ের ভিত্তিতে এ পৃথিবীকে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির যুক্ত কার্য বলে তাকে অর্থপূর্ণ করার চেষ্টা করেছেন। নীতি-জ্ঞানী আত্মার পক্ষে এ পৃথিবী একটা পরীক্ষার স্থল—একে সফলতার সঙ্গে পার হলে, সে আত্মাগুলোর পক্ষে প্রকৃত সত্তার স্বাদ পাওয়া সম্ভবপর। কারণ সে আদিসত্তাই এভাবে প্রকাশিত হয়ে মানবাত্মার সামনে নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। তার পরবর্তী তত্ত্বজ্ঞানীদের মধ্যে শেলিং ও হেনেট কতকগুলো স্বতঃসিদ্ধের ভিত্তির উপর তাদের দার্শনিক মতবাদ গড়ে তুলেছেন। শেলিং-এর মতবাদ অনুসারে 'চিন্তা এবং অস্তিত্বের মধ্যে মৌলিক ঐক্য রয়েছে'। এরূপ স্বতঃসিদ্ধ গ্রহণ করার মূলে শেলিং-এর উদ্দেশ্য ছিলো—অবভাস ও মূল বিষয়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপন। ক্যাণ্ট তার বিশ্লেষণের দ্বারা তাদের মধ্যে যে পার্থক্যের সৃষ্টি করেছিলেন, শেলিং সে পার্থক্যের মধ্যে আবার ঐক্য সৃষ্টির জন্যে এ ফর্মুলা গ্রহণ করেছিলেন। এ নীতি স্বীকার করলে মানব-মানসের নিকট প্রতিভাসিত জগৎ এবং চিন্তার জগতের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকার বিষয় নয়। কারণ চিন্তার জগতে যে যুক্তি কার্যকরী, অভিজ্ঞতার জগতেও সে যুক্তিই কার্যকরী। তবে এ

স্বতঃসিদ্ধের মূলে কোনো প্রমাণ বর্তমান নেই। একে এক প্রত্যয় বলেই গণ্য করা যায়। ঠিক এমনিভাবে হেগেলও তার দার্শনিক চিন্তার মূল সূত্র হিসেবে একটা স্বতঃসিদ্ধকে গ্রহণ করেছেন। তাঁর কাছে যা কিছু সত্য, তা-ই যুক্তিপূর্ণ এবং যা কিছু যুক্তিপূর্ণ তা-ই সত্য। আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে এমন কোনো বিষয় নেই যাকে যুক্তিপুর্ণ বলা চলে। তাতে নানা অসঙ্গতি ও বিস্ময়ের বিষয় রয়েছে। সে যুক্তিপূর্ণ ফর্মুলার অস্তিত্বও প্রমাণিত হয় নি। তাই দেখা যায় আধুনিক যুগের সূচনাতে ডেকার্থে যে সন্দেহবাদের প্রবর্তন করেছিলেন এবং তার ফলে যে দর্শনের সূচনা হয়েছিলো, সে পরিণতিতে দীর্ঘকাল যেসব দার্শনিক মতবাদের প্রবর্তন হয়েছে, তাদের মধ্যে প্রত্যয়ের অস্তিত্ব ও কার্যকারিতা রয়েছে। পুরাকালের দর্শনের মধ্যে প্লেটো ও এ্যারিষ্টটলের মধ্যে যেমন---তেমনি আধুনিক কালের হেগেলের দর্শনের মধ্যেও প্রত্যয়ের স্থান রয়েছে।

সদ্য বিগত যুগে বের্গসোঁ যে জীবনবাদী দর্শনের প্রবর্তন করেছিলেন তার মধ্যেও জীবনীশক্তিকেই এ জগতের আদিসত্তা বলে গণ্য করেছেন। ডারউইন ও লেমার্কের জীববিজ্ঞানের ধারণাগুলোর ভ্রান্তি প্রদর্শন করে তিনি সরাসরি যে জীবনীশক্তির ধারণা পেশ করেছেন, তাতে জীবনীশক্তির প্রতি তার এক মহা-প্রত্যয়ই প্রকাশ পেয়েছে। অতি আধুনিক কালে অস্তিত্ববাদীগণ অস্তিত্বকে সার বা Essence-এর পূর্ববর্তী বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাতেও অস্তিত্বের প্রতি তাদের প্রত্যয়ই প্রকাশ পেয়েছে। অস্তিত্ব সারের পূর্ববর্তী

হলেও, অস্তিত্বই যে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয়---তার প্রমাণ তারা যা দিয়েছেন তাতে মনে হয় অস্তিত্বের ক্রিয়াশীলতাই ছিল তাদের প্রমাণের বিষয়বস্তু। সে ক্রিয়াশীলতাকে তারা এতো গুরুত্ব না দিয়ে শুধুমাত্র অস্তিত্বের উপর এতো গুরুত্ব আরোপ করার দরুন মনে হয় তাতে যুক্তির চেয়ে প্রত্যয়ের ক্রিয়াশীলতাই তাদের মানসে প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে।

তেমনি যৌক্তিক বাস্তবতাবাদের (Logicl positivism) মধ্যে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকেই জ্ঞানের একমাত্র রূপ বলে গ্রহণ করার মধ্যে সেই প্রত্যয়শীলতাই আবার অন্য রূপ ধরে দেখা দিয়েছে।

আমরা পূর্বেই বলেছি মানব-জীবনের আদি বৃত্তি হচ্ছে--এ বিশ্বের সর্বত্র বিরাজমান সংগ্রামের মধ্যে টিকে থাকা। তার সঙ্গে সঙ্গে মানব-জীবনের অপর বৃত্তি হচ্ছে অমরত্বলাভ। সে অমরত্বলাভের জন্যেই মানুষ জ্ঞানের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয় এবং তার পরিণতিতে বিভিন্ন মতবাদ গড়ে তোলে। মানব-মানস সে মতবাদের মধ্যে একটা আশ্রয় খুঁজে পেতে চায়। দার্শনিক মতবাদগুলো ধর্মীয় মতবাদের মতো সেরূপ এক একটা আশ্রয়। তাদের মধ্যে পার্থক্য এই--ধর্মের ক্ষেত্রে প্রত্যয়ের দিকটাই প্রধান--যুক্তির দিক তত প্রবল নয়। অপর-দিকে দর্শনের ক্ষেত্রে যুক্তির দিকই প্রবল—প্রত্যয়ের দিক প্রেক্ষাপটে থেকে যায়। এজন্যে দর্শনের আলোচনাকে বিশুদ্ধ যুক্তিজাত বলেই মনে হয়।

দর্শনের মূল লক্ষ্য কোনো চিরস্থায়ী বিষয়ের সন্ধান হলেও, তার সঙ্গে সঙ্গে আরও নানাবিধ বিষয়ের আলোচনা প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। তার মধ্যে আমাদের জ্ঞানের বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। জ্ঞানের মাধ্যম সম্বন্ধে আমাদের শ্রদ্ধা না থাকলে, জ্ঞাত বিষয় সম্বন্ধেও কোনো শ্রদ্ধা থাকতে পারে না, এবং তাকে আমরা সত্য বলে গ্রহণ করতে পারি নে। জ্ঞানের মাধ্যমের সঙ্গে মূল্যমানেরও যোগ রয়েছে। জ্ঞানের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা থাকলে, তার মধ্যে ব্যবহৃত মূল্যমানগুলোকেও আমরা শ্রদ্ধা করতে বাধ্য। অতএব দর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে জ্ঞানের মাধ্যমে মূল্যমানগুলো সম্পর্কে আলোচনা হওয়া প্রয়োজনীয়।

জ্ঞানের মাধ্যম ও মূল্যমান

মানব-মানস যে এক ও অবিভাজ্য তার প্রমাণ পাওয়া যায় আমাদের মানসের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ঐক্যসূত্রের মধ্যে। সাধারণত মনোবিজ্ঞানে মনন, প্রক্ষোভ ও ইচ্ছাশক্তি বলে যে বিভাগ করা হয় —তা অত্যন্ত অপ্রাকৃত। মননের মধ্যেও প্রক্ষোভ বা ইচ্ছাশক্তির কার্যকারিতা থাকে প্রচ্ছন্নভাবে এবং এ প্রত্যেকটি বিভাগের আদি ও অন্তের কোনো স্পষ্ট সীমারেখা পাওয়া যায় না। অর্থাৎ মননের উৎপত্তিস্থলে কেবলমাত্র মননই রয়েছে, একথা সত্য নয়। প্রক্ষোভ থেকেও মননের উৎপত্তি হতে পারে এবং ইচ্ছাশক্তিতে তার প্রকাশ দেখা দিতে পারে। মানব-জ্ঞানের নানাবিধ পর্যায়ে এ তিনটি বৃত্তি থাকে কার্যকরী। এদের কার্যকারিতার ফলেই মানবজীবনে নানাবিধ মানের উৎপত্তি হয়। এজন্যেই মানগুলোকে তর্কশাস্ত্রমূলক, ভক্তিমূলক বা বাসনামূলক ইত্যাদি নানাভাবে বিভাগ করা যায়।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন হচ্ছে জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করা হয়—তাদের সঙ্গে মূল্যমানগুলোর কিরূপ সম্বন্ধ বর্তমান?

মানব-জ্ঞানের নানাবিধ পর্যায়ের বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই তাতে কতকগুলো মাধ্যম রয়েছে। সেগুলো আমাদের অভিজ্ঞতা-জাত বা অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ সে প্রশ্ন না তুলে, আমাদের কাছে বিচার্য বিষয় হচ্ছে বাস্তবিকই ওগুলো সার্বজনীন ও অপরিহার্য কিনা? যদি তাই হয় তা হলে যেভাবেই তাদের উৎপত্তি হোক না কেন, তাদের সঙ্গে মূল্যমানের সম্বন্ধ আবিষ্কার করলে জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে ঐক্য প্রতিষ্ঠার ফলে আমরা সন্তোষ লাভ করতে পারি। প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতায় শৃঙ্খলা সৃষ্টিতে স্থান, কাল, বস্তু, কার্যকারণের নীতি, সম্বন্ধ প্রভৃতির কার্যকারিতা স্বীকার করতে আমরা বাধ্য হই। যে-কোনো বিষয়কে জানতে হলে তাকে স্থান, কালে অবস্থিত বস্তুরূপেই আমাদের জানতে হয় এবং তাকে হয়তো বা কারণ না হয়তো কার্যরূপে অন্য বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্তরূপেই আমাদের জানতে হবে। কাজেই এ মাধ্যমগুলো সার্বজনীন ও অপরিহার্য।

স্বজ্ঞাকে বার্গসোঁ বা ডীনইন্‌পে জ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ পর্যায় বলে স্বীকার করেছেন। স্বজ্ঞা ও মননের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও স্বজ্ঞার মধ্যে আমরা কতকগুলো সাধারণ লক্ষণ আবিষ্কার করতে পারি। মননের বিষয়বস্তুর মতো এতে বিশ্লেষণের কোনো সুযোগ থাকে না। এতে প্রমাণেরও কোনো প্রয়োজন দেখা দেয় না। স্বজ্ঞার বিষয়বস্তু স্বতঃপ্রমাণ হিসেবে আমাদের কাছে দেখা দেয়। এতে বিষয় ও বিষয়ী একে অপরের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়।

ধর্মজগতের জ্ঞানের মাধ্যমগুলোকে আপাতঃদৃষ্টিতে মননসংক্রান্ত জ্ঞানের মাধ্যমের সম্পূর্ণ বিরোধী বলেই মনে হয়। তবু তলিয়ে দেখলেই বুঝা যায়, তাতেও কতকগুলো কার্যকরী প্যাটার্ন রয়েছে। ধর্মজগতে কাল, বিচ্ছিন্নতা ও অমঙ্গলকে মনে করা হয় ভ্রমাত্মক দৃষ্টির ফল। তার উপর বিষয়ী এক্ষেত্রে বিষয়ের মধ্যে তার সত্তার অস্তিত্ব হারায়। তবে এতে তার জীবনে দুঃখের পরিবর্তে দেখা দেয় চরম সন্তোষ।

জীবনের এ তিনটি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত মাধ্যমগুলোর মধ্যে প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতার সুশৃঙ্খলা বিধানের ব্যবহৃত মাধ্যমগুলো সার্বজনীন ও অনিবার্য। তবে স্বজ্ঞাতে ও ধর্মে ব্যবহৃত মাধ্যমগুলো তাদের স্বকীয় ক্ষেত্রে অনিবার্য হলেও মানব-জীবনের সকল ক্ষেত্রে সার্বজনীন নয়।

বৈজ্ঞানিক জগতের মাধ্যমগুলো কিন্তু পরিবর্তনশীল। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যায়, ডেমোক্রিটাসের পরমাণু সংক্রান্ত ধারণাও বর্তমান কালের পরমাণুবাদে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। টলেমির পৃথিবী-কেন্দ্রিক সিদ্ধান্ত সেযুগে অবশ্য গ্রহণীয় ধারণা বলে স্বীকৃত ছিলো। কোপারনিকাসের সূর্য-কেন্দ্রিক ধারণা প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে বর্তমানে টলেমির ধারণার কোনো মূল্য নেই। তবে কোপারনিকাসের এ ধারণাও সর্বশেষ ধারণা নয়। এর পরেও নানাবিধ ধারণা দেখা দিতে পারে। কাজেই তাদের সার্বজনীনতা বা অনিবার্যতা সাময়িক—চিরন্তন নয়।

ইতিহাসের ঘটনাবলীকে সুষ্ঠুভাবে বুঝতে যেয়ে আমরা কতকগুলো মাধ্যম ব্যবহার করি। গুহাযুগ, পশুচারিত পর্যায়, কৃষিযুগ, সামন্তবাদের যুগ, পুঁজিবাদের যুগ, সমাজতন্ত্রের যুগ প্রভৃতি চিন্তার মাধ্যমে আমরা মানব-সমাজের ইতিহাস পাঠ করি। এতে মূল্যায়ন করে আমরা বিবর্তনও আবিষ্কার করি। তবে এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই: এ মাধ্যমগুলো এ দুনিয়ার কোনো এক বিশেষ যুগে সকল দেশের মানুষের জীবনে প্রযোজ্য নয়। এ দুনিয়ার সকল মানুষ কোনো এক কালে কৃষি পর্যায়ের অথবা সামন্ততন্ত্রীয় পর্যায়ের ছিলো না। মোটের ওপর অধিক সংখ্যক মানুষের জীবনধারাকে এসব পর্যায়ের আলোকে পাঠ ও ব্যাখ্যা করা যায়। এতে এক পর্যায় থেকে অপর পর্যায়কে উন্নততর বলতে যেয়ে আমরা মূল্যমান স্বীকার করি।

সাহিত্য জগতে মূল্যায়ন আরো স্পষ্ট। কাব্য-নাটক, গল্প ও উপন্যাসের উপজীব্য হচ্ছে বিভিন্ন মূল্যমানের আলোকে জীবনকে পাঠ করে, সে সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। তেমনি প্রবন্ধ বা নিবন্ধের মধ্যে কোনো এক মূল্যমানের আলোকে এ জগতের কোনো বিষয় বা মানবজীবনের সঙ্গে জড়িত কোনো বিষয়ের বিচার করা হয়। তবে সে মূল্যমানগুলো চিরস্থায়ী বা অপরিবর্তনীয় নয়। যুগে যুগে মানবজীবনের পরিবর্তনের ফলে তার মূল্যমানেরও পরিবর্তন হচ্ছে এবং তার পরিণতিতে দেখা দিচ্ছে সাহিত্যের পরিবর্তন।

তাহলে আপাততঃ আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি, জ্ঞানের প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যবহৃত মাধ্যমগুলো সার্বজনীন ও অনিবার্য। স্বজ্ঞা বা ধর্মীয় পর্যায়ে ব্যবহৃত মাধ্যমগুলো সেই সেই বিশেষ পর্যায়ে অনিবার্য, তবে তারা মানবজীবনে সার্বজনীন নয়। ইতিহাসের ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত মাধ্যমগুলো সার্বজনীনও নয়, অনিবার্যও নয়। বিজ্ঞানে ব্যবহৃত মাধ্যমগুলো কোনো বিশেষ যুগে সার্বজনীন ও অনিবার্য হলেও তারা চিরন্তন নয়, তারা পরিবর্তনশীল এবং খুব-সম্ভব উৎপাদন ব্যবস্থার পরির্তনের ফলেই মানবজীবন তথা সাহিত্যের মূল্যমানগুলোর পরিবর্তন হয়।

ঐ মাধ্যমগুলোর মধ্যে স্থায়িত্ব, সার্বজনীনতা ও অনিবার্যতার দিক দিয়ে জ্ঞানের প্রাথমিক পর্যায়ের মাধ্যমগুলো অর্থাৎ স্থান, কাল, পাত্র, কার্যকারণ পরম্পরানীতি, সম্বন্ধ সর্বতোভাবে অপরিহার্য গতিকে এদের সঙ্গে মূল্যমানের সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা করা যাক।

এগুলো যুক্তির দিক থেকে যে বিশিষ্ট মূল্যমান তাতে তর্কের কোনো অবকাশ নেই। প্রশ্ন হচ্ছে জীবনের অন্য কোনো পর্যায়ে তারা মূল্যমান বলে গণ্য হতে পারে কিনা? মানব-জীবনকে এক ও অখণ্ড হিসেবে গ্রহণ করলে স্পষ্টই বুঝা যায়, জীবনের চলার পথে এগুলোর সাহায্য ও সহায়তা ব্যতীত এক পা-ও অগ্রসর হওয়ার উপায় নেই। জীবন আহবের কথা যদি ছেড়েই দেওয়া যায়, তবু শুধুমাত্র টিকে থাকতে হলে মানুষকে স্থান-কালের মধ্যেই তার স্থান নির্ণয়

করতে হবে। যে-কোনো পার্থিব বিষয়কে বস্তু হিসেবে ধরে নিয়ে, তার উপর অন্যান্য বিষয়ের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়াকে গণ্য করে জ্ঞানের তথা জীবনের পথে অগ্রসর হতে হবে। কাজেই কেবল জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রেই তারা মূল্যমান নয়, জ্ঞান-বিদ্যার বহির্ভূত জীবনের সাধারণ ক্ষেত্রেও তারা মূল্যমানই বটে।

মানব-মানস সুদূর অতীতে যেদিন জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাদের আবিষ্কার করে, সেদিন তাদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেও ত্রুটি করে নি। সময় বা কালকে ঐশ্বরিক পর্যায়ে উন্নীত করে তার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করেছে। দেহর বা কালকে আল্লার অপর গুণে পরিণত করা হয়েছে। তেমনি বাসিত বা Extension-কে আল্লার অপর গুণ বলে গ্রহণ করা হয়েছে।

এতে স্পষ্টই প্রমাণিত যে জ্ঞানের মাধ্যম হলেই মূল্যমান বলে পরিগণিত হওয়াতে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। অপরদিকে মূল্যমান হলেও তা জ্ঞানের মাধ্যম হতে কোনো বাধা নেই।

ইতিহাসের ধারায় ইচ্ছার স্বাধীনতা

রাজনীতিতে ও দর্শনে স্বাধীনতার ধারণা অতিশয় পুরনো। যুগে যুগে নানাভাবে স্বাধীনতার সংজ্ঞাদান ও তার সপক্ষে বা বিপক্ষে নানাবিধ যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে। রাজনীতিতে স্বাধীনতার অর্থ অপর কোনো দেশ কর্তৃক শাসিত না হয়ে সেই বিশেষ দেশের পক্ষে রাষ্ট্র পরিচালনা করার শক্তি অর্জন। দর্শনে সাধারণত মানব-ইচ্ছা সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে, তা স্বাধীনভাবে আপনার ভালো-মন্দ বা পাপ-পুণ্যের বিচার করে যে-কোনো একটিকে গ্রহণ করতে পারে কিনা। এ প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে মানুষের নৈতিক জীবনও ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। মানুষের বিচার করার ক্ষমতা বা বিচার শেষে যে-কোনো বিকল্পকে গ্রহণ করার স্বাধীনতা না থাকলে, কোনো আইনই তার উপর প্রয়োগ করা যায় না। কেবলমাত্র ইহলৌকিক আইনই নয়, ধর্মীয় আইনও তার উপর প্রযোজ্য হতে পারে না।

কাজেই নীতিবিজ্ঞান ও ধর্ম থেকেই স্বাভাবিকভাবে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। তবে জ্ঞানের ক্ষেত্র থেকেও এ প্রশ্নের উত্থাপন অবান্তর নয়। জ্ঞানবিদ্যার আলোচনাতে দেখা যায়—জ্ঞানের শর্ত, তার উৎপত্তির

কারণ ও সীমা নিয়েই আলোচনা করা হয়। সঠিকভাবে জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করে জানার ক্ষমতা মানব-মানসের রয়েছে কিনা সে সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন তোলা হয় নি। হার্বার্ট স্পেন্সার বা কাণ্ট জ্ঞানের সীমা নির্দেশ করে বলেছেন, সারসত্তা মানুষের জ্ঞানের পরিধিতে স্থিত নয়। সে পরিধির বাইরে অবস্থিত, কাজেই অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত। এতে জ্ঞানের সীমিত রূপ সম্বন্ধে মন্তব্য হয়েছে, কিন্তু এ সীমা পর্যন্ত যে জ্ঞান অগ্রসর হতে পারে, সে সম্বন্ধে উভয়েই একই মত পোষণ করেছেন। তবে মানব জ্ঞানের গতিতে বা কার্যকারিতার কোনো কোনো অনিবার্যতা রয়েছে কিনা সে সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করা হয় নি। হয়তো বা স্বতঃসিদ্ধ হিসেবেই তাকে গ্রহণ করা হয়েছে।

অপরদিকে এ স্বাধীনতার প্রশ্নের উত্তর যা দেওয়া হয়েছে, তাদের অধিকাংশই কোনো বিশেষ বিশ্বদৃষ্টির ফল। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ধর্মসংক্রান্ত বা দার্শনিক মতবাদের আলোকে মানব-জীবনের স্বাধীনতার ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এবং সে-ব্যাখ্যার সঙ্গে বিশ্বদৃষ্টির রয়েছে সামঞ্জস্য। দর্শনের ইতিহাসে তার উদাহরণ জাজ্বল্যমান।

গ্রীকদের চিন্তাধারার পূর্ণবিকাশ হয় অ্যারিস্টটলের দার্শনিক মতবাদে। অ্যারিস্টটল-উত্তর যুগে দর্শনের স্থান অধিকার করে নীতিশাস্ত্র। এ হিসেবে আপাতত এ ক্রান্তিকালকে অধিকতর মনোধর্মী বলা যায়। তবে তা ছিলো মানব-জীবনের একটি সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ।

নৈতিক আইন ও তার রূপায়ন নিয়েই এপিকিউরিয়ান বা স্টোয়িকগণ ছিলেন ব্যস্ত। এজন্যে তাঁদের চিন্তাধারা ব্যাপ্তি লাভে সমর্থ হয় নি। মানব-জীবনের বা মানব-ইচ্ছার স্বাধীনতাকে তাঁরা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করেন নি। তাঁদের নিজস্ব দর্শনের আলোকেই তার বিচার করেছেন। এপিকিউরিয়ানরা ছিলেন ডেমোক্রিটাসের অনুসারী পরমাণুবাদী। তাই তাঁদের কাছে এ জগতের সব কিছুর মূলে ছিলো একমাত্র পরমাণুর খেলা। মানব-দেহও সেই একই পরমাণুর দ্বারা গঠিত বলে তা-ও পরমাণুর স্থিতাবস্থামূলক আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তবে পরমাণুর পক্ষে আপন গতিপথ থেকে একটু বাঁকা-ভাবে চলারও ক্ষমতা রয়েছে বলে মানব-জীবনে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ রয়েছে।

তেমনি স্টোয়িকদের বিশ্বদৃষ্টিতে ছিলো অ্যারিস্টটলের মতবাদের একটি বিকৃত সংস্করণ। তাঁরা অ্যারিস্টটলের মতো আকার ও জড়পদার্থ বলে দুটো নীতি স্বীকার করে নিয়েছিলেন, এবং একটির সঙ্গে অপর–টিকে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত বলে সিদ্ধান্ত করেছিলেন। তবে তাঁরা আকার ও জড় উভয়কেই শারীরিক স্থিতি বলে গ্রহণ করেছিলেন, এবং একটিকে সক্রিয় ও অপরটিকে নিষ্ক্রিয় বলে ধারণা করেছিলেন। এমন কি মানবাত্মা ও ঈশ্বরকেও দেহী বলে ধরে নিয়েছিলেন। এ বিশ্বের আদি কারণ হিসেবে রয়েছে সর্বত্র-ব্যাপ্ত একটি শক্তি বা অগ্নি এবং পরম শুভযুক্তি। মানুষের দেহের অভ্যন্তরস্থ আত্মার মতো সে যুক্তি বা লগজ (Logos) এ বিশ্বের অভ্যন্তরে বিরাজমান। কাজেই

মানব-জীবনের স্বাধীনতার অর্থ ছিলো যুক্তির নির্দেশ মতো কর্ম সম্পাদন, অর্থাৎ বিশ্বের সেই চিরন্তন নীতির অনুবর্তী হয়ে কাজ করা। কাজেই স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, এপিকিউরিয়ান বা স্টোয়িক-গণের দ্বারা মানব-স্বাধীনতার অর্থ নির্ধারিত হচ্ছে তাদের দার্শনিক মতবাদ দ্বারা।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ক্রান্তিকালে, সেণ্ট অগাস্টিন ও সেণ্ট টমাস একুইনাস এ সম্বন্ধে যে সব মত প্রকাশ করেছেন, সেগুলোও তাঁদের ধর্মীয় মতবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত। সেণ্ট অগাস্টিনের মতে মানুষ স্বাধীনভাবে ঈশ্বরের করুণালাভে সমর্থ হয় না, বরং করুণার দ্বারাই স্বাধীনতা লাভ করে। সেণ্ট টমাস একুইনাসের মতে মানব-জীবনে বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তির রয়েছে পৃথক কার্যকারিতা। বুদ্ধি দ্বারা ইচ্ছাশক্তি চালিত হয়। তবে এতে বুদ্ধির কোনো জোর-জবরদস্তি নেই। বুদ্ধি ইচ্ছ শক্তির নিকট কোনো বিষয় সংক্রান্ত উদ্দেশ্য অথবা লক্ষ্য উপস্থাপিত করে তাকে পরিচালনা করে। তা সত্ত্বেও কিন্তু আত্মার রাজ্যে ইচ্ছাশক্তিই আদি-সঞ্চালক। ইচ্ছাশক্তির দ্বারা প্রণোদিত হয়েই বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়রাজি কর্মে প্রবৃত্ত হয়। এভাবে একের উপর অপর বৃত্তির কার্যকারিতা থাকলেও ইচ্ছাশক্তির উপর বুদ্ধির রয়েছে প্রাধান্য। ডন স্কুটাসের মতে, ইচ্ছাশক্তিই মানব-জীবনে অধিকতর প্রভাবশালী। ইচ্ছাশক্তি-সঞ্চালিত কর্মের অগ্রবর্তীর কারণ হচেছ কল্পনা ও বুদ্ধি। তবে তারা ইচ্ছাশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে না। বিবেকের বা প্রলোভনের দ্বিবিধ বিকল্প থেকে ইচ্ছাশক্তি

যে-কোনো একটিকে গ্রহণ করতে পারে। এসব মতবাদের আলোচনা থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, এঁরা ইচ্ছাশক্তির বা বুদ্ধির প্রাধান্য স্বীকার করে নৈতিক জীবনকে টিকিয়ে রাখতে ছিলেন আগ্রহশীল।

পূর্বেই বলা হয়েছে আধুনিক যুগের সূচনা হয় দর্শন সম্বন্ধীয় ধারণা থেকে। ডেকার্ট সর্বপ্রথম দার্শনিকরূপে দেখা দিলেও তাঁর মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করেন স্পিনোজা। তিনি জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছাশক্তির মধ্যে কোনো পার্থক্য স্বীকার করেন নি। তাঁর কাছে ইচ্ছাশক্তি একটি ধারণা মাত্র। তার কাজ হচ্ছে আপনাকে হয় স্বীকার করা, না হয় অস্বীকার করা। এভাবে স্বীকৃতিদান বা অস্বীকৃতি—স্বাধীনভাবে নির্বাচনের ফলপ্রসূত নয়, বরং কোনো ধারণাজাত ফল। ইচ্ছার স্বাধীনতা বলতে কোনো কিছুই নেই। প্রকৃতিতে সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত। সব কিছুই সেই আদিসত্তা বা সারবস্তু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

বুদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে, অর্থাৎ সংবেদন, কল্পনা ও যুক্তির পর্যায়ক্রমে রয়েছে ইচ্ছারও নানাবিধ পর্যায়। আমাদের আত্মা যেমন বিভিন্ন জিনিসের অর্থ গ্রহণে সমর্থ হয়, এবং তার ধারণাগুলো যখন পরিচ্ছন্ন হয়, তখন তার আর কোনো আবেগ থাকে না। তখনই তার জীবন-মুক্তি হয়। যে ব্যক্তি সত্যিকার কারণের সন্ধান পেয়েছে, সে এ বিশ্বচরাচরের সব কিছুকেই ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধে আবদ্ধ

দেখবে। তখনই তার পক্ষে ভগবানের সঙ্গে মননশীলতাজাত প্রেমের সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়ার রয়েছে সম্ভাবনা।

এ ক্ষেত্রেও দেখা যায়, স্পিনোজা তাঁর দার্শনিক মতবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েই ইচ্ছাশক্তির বিচার করেছেন। তাঁর দার্শনিক মতবাদ অনুসারে এ বিশ্বের মূলে রয়েছে এক ও অদ্বিতীয় সারবস্তু। তার রয়েছে অসংখ্য গুণাবলী। সে-গুণাবলীর মধ্যে চিন্তা (thought) ও ব্যাপ্তি (extension) মানুষের জীবনে রয়েছে বলে মানুষ এ দুটো গুণাবলীকে জানতে পারে। এ দুটো আবার সমান্তরাল রেখার মত পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। তবে চিন্তাজগতের ও জড়জগতের সব কিছুই কার্যকার-পরম্পরা শৃঙ্খলে আবদ্ধ এবং তাদের মধ্যে রয়েছে এক অমোঘ অনিবার্যতা। সে অনিবার্যতার মূল হচ্ছে সেই সারবস্তু (বা substance) যা থেকে এ বিশ্বের সব কিছুরই উৎপত্তি। কাজেই ইচ্ছাশক্তি বলে কোনো কিছু না থাকলেও এবং সে ইচ্ছাশক্তি আমাদের চিন্তারই একটি রূপ হলেও, তা সর্বাবস্থায় নিয়ন্ত্রিত। তবে স্পিনোজা এ অনিবার্যতার মধ্যেও মুক্তির সন্ধান পেয়েছেন। তা সম্ভবপর হয় প্রকৃত জ্ঞানের মধ্যে। সব কিছুর উৎপত্তি সেই সারবস্তু থেকে—এ জ্ঞানলাভের পরই মানুষ প্রকৃত মুক্তিলাভ করে ঈশ্বর-প্রেমে আকৃষ্ট হয়।

এ প্রসঙ্গে আধুনিক দর্শনের পরবর্তী চিন্তানায়ক লকের মতবাদ কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন প্রকৃতির। তাঁর মতবাদ অনুসারে স্বাধীনতার

প্রসঙ্গে মূল প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের কর্মের স্বাধীনতা রয়েছে কিনা? ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকার করে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন—ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকলেই কর্মের স্বাধীনতা রয়েছে বলে কোনো অনিবার্য সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছা যায় না। মনোবিজ্ঞানে আমাদের বাসনার নানা পর্যায় বিশেষভাবে দেখানো হয়েছে। বাসনা থেকে উদ্দেশ্য বা মতলব এবং সর্বশেষে অভিপ্রায়ের কিভাবে উৎপত্তি হয়, এবং অভিপ্রায় থেকে আমরা কিভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হই তাও বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে অভিপ্রায় থেকে সরাসরি কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া সব সময় সম্ভবপর নয়। প্রাকৃতিক বা সামাজিক নানাবিধ কারণ এতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে। সে প্রতিবন্ধকতাকে পরাভূত করে মানুষ স্বকীয় ইচ্ছাব প্রকাশ করতে পারে কিনা—তা-ই লকের মতে আলোচ্য বিষয়। এ প্রশ্ন অত্যন্ত জটিল এবং সহজে মীমাংসার যোগ্য নয়। অনেক ক্ষেত্রেই তা সম্ভবপর নয়। তবে লকের মতে ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে কিনা এ প্রশ্ন অবান্তর। মানুষের অভিপ্রায়কে কর্মে রূপান্তর করার স্বাধীনতা আছে কিনা এ ক্ষেত্রে তা-ই হচ্ছে আসল প্রশ্ন। লকের পরে লাইবনিজও এ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কিন্তু তাঁর দার্শনিক মতবাদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। তাঁর ধারণা অনুসারে, এ জগতের আদিসত্তা কতকগুলো আধ্যাত্মিক পরমাণু বা মনাদ্। এগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাদের মধ্যে বাইরের থেকে কোনো জ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর নয়। তাদের নিজেদেব আত্মজগতেই রয়েছে জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার। বাইরের উদ্দীপকগুলোর কাজ হচ্ছে মনাদ্দের আভ্যন্তরীণ জ্ঞানকে জাগ্রত করা। তবে সে

উদ্দীপকগুলোর পক্ষে কোনো ধারণার সৃষ্টি করা সম্ভবপর নয়। বিভিন্ন ধারণা এবং চিন্তার মাধ্যম আত্মার মাঝে অবস্থিত। সেগুলো বাইরের অভিজ্ঞতার ফলে জাগ্রত হয়, সৃষ্ট হয় না। এ সূত্রের আলোকেই লাইবনিজ ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্বন্ধেও আলোচনা করেছেন। আত্মা সম্পূর্ণভাবে বহির্বিশ্ব থেকে স্বতন্ত্র বলে তার পক্ষে আত্মনিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে। প্রত্যেকটি মনাদ এক একটা সার্বভৌম সাম্রাজ্যের মতো স্বতন্ত্র বলে আত্মার পক্ষে নির্বাচনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা বর্তমান। তবে আত্মা খামখেয়ালীর মতো যখন যা ইচ্ছা হয় তাকেই নির্বাচন করে না। তার নির্বাচনের ভাষাও তৎকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

লাইবনিজের পরে ইচ্ছার স্বাধীনতা নিয়ে কাণ্ট বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনা সাধারণত দুটো ভাগে বিভক্ত। প্রথমদিকে তিনি তত্ত্বীয় জ্ঞানের বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, তাতে তিনটি পর্যায় রয়েছে। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের জগতে আমরা বাইরে থেকে যে সংবেদন পাই তাকে স্থান-কালের আকারে বিন্যাস করে প্রত্যক্ষিত বিষয়ে (percept) পরিণত করি। তবে এতে সে প্রত্যক্ষিত বিষয় জ্ঞানের বা অবধারণের অন্তর্ভুক্ত হয় না। তার উপর আমাদের সহজাত নানাবিধ মাধ্যম (category) আরোপ করে আমরা তাদেরকে অবধারণের (judgment) বিষয়বস্তুতে পরিণত করি। পরিশেষে ঈশ্বর, বহির্বিশ্ব এবং আত্মার ধারণার আলোকে এসব বিচারগুলোকে আমরা সংক্ষিপ্ত করি। তবে সেগুলো জ্ঞানের রাজ্যে গঠনমূলক কোনো ধারণা নয়। তারা জ্ঞানকে গঠন করে না, বরং নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের অস্তিত্বের

প্রমাণের পক্ষে কোনো সংবেদন নেই বলে তাদেরকে আমরা গঠনমূলক বলে গ্রহণ করতে পারিনে।

তবে জ্ঞানের এ তিন পর্যায়েই একটা তুরীয় একতার নীতি (Transcendental unity of apperception) রয়েছে কার্যকরী। তা না হলে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের স্তর থেকে বুদ্ধির স্তরে আমাদের পক্ষে আরোহণ করা সম্ভবপর হতো না। এ একতা বাইরে থেকে আসে না, আসে আমাদের অন্তর থেকে। এ জন্যে এ ঐক্যের নীতি বাইরের কোনো বিষয়ের উপর নির্ভরশীল নয়। এ তুরীয় ঐক্যের নীতির স্বীকৃতি ব্যতীত জ্ঞানলাভ কিছুতেই সম্ভবপর নয়। কারণ প্রত্যক্ষিত বিষয়-গুলোর উপর জ্ঞানের মাধ্যমগুলোকে আরোপ করতে হলে একদিকে যেমন তার প্রয়োজন, অপরদিকে মাধ্যমগুলোর সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধেরও স্বীকৃতির প্রয়োজন। তেমনি এক পর্যায়ের সঙ্গে অপর পর্যায়ের যোগসূত্রের জন্যেও এ ঐক্যের নীতির স্বীকৃতির প্রয়োজন। তা না হলে জ্ঞানের রাজ্যে এক পর্যায় থেকে অপর পর্যায়ে উত্তরণ কিছুতেই সম্ভবপর হতো না। ইচ্ছার স্বাধীনতার প্রশ্ন আমাদের নৈতিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। ইচ্ছার স্বাধীনতা না থাকলে মানুষের কর্মফলকে ভালো-মন্দ বলার কোনো সার্থকতা থাকে না। পাপপুণ্য মঙ্গলামঙ্গলেরও কোনো মূল্য থাকে না। মানুষ যদি প্রকৃতির অন্য সব বিষয়বস্তুর মতো, অথবা জীবজন্তুর মতো প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহলে তার কাজকর্মের কোনো অর্থ থাকে না। নৈতিক জীবনে মানুষকে স্বাধীন ও স্বকীয় শক্তি দ্বারা
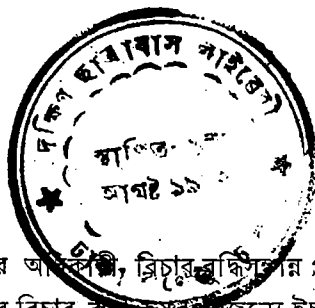
পরিচালিত, নির্বাচন ক্ষমতার অধিকারী, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী বলে স্বীকার করে তার কৃতকর্মের বিচার করা [illegible] এজন্যে ইচ্ছার স্বাধীনতাকে কান্ট নৈতিক জীবনের স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এতে অবশ্য তাঁর যুক্তি অনস্বীকার্য। তবে জ্ঞানের রাজ্যেও চিন্তার স্বাধীনতা রয়েছে, সে বিষয়ে তিনি কোনো আলোচনা করেন নি। কারণ সেক্ষেত্রে তাঁর ধারাতে এ আলোচনার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। তবে যে আলোচনা তিনি করেছেন, এতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, —তত্ত্বীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে (in theoretical knowledge) সে তুরীয় ঐক্যের নীতির আধার আত্মজ্ঞানকে (self consciousness) তিনি স্বাধীন এবং স্বকীয় ধারায় প্রবর্তিত বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।

একথা অবশ্য সত্য যে, তিনি এ নীতিকে এক বিশিষ্ট ধারায় প্রবর্তিত বলে প্রদর্শন করেছেন। খামখেয়ালীর মতো সে যথাইচ্ছা বিচরণ করতে পারে না। তবে এক বিশিষ্ট ধারায় সে নীতির আদি উৎস আমাদের আত্মজ্ঞান প্রবর্তিত হয় বলে, তার উপর বাইরের কোনো নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী নয়, তাই তাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলেই গ্রহণ করতে হয়। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, যে স্বাধীনতার জন্যে কান্ট নীতিজ্ঞানের রাজ্যে ছিলেন ব্যাকুলভাবে অনুসন্ধিৎসু, তাকে তত্ত্বীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি পূর্বেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এতে স্পষ্টই মনে হয়, তত্ত্বীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে নীতি তাঁর কাছে ছিলো অস্পষ্ট, নৈতিক জীবনের আলোচনাকালে তাই তাঁর কাছে অপরিহার্য নীতিরূপে দেখা

দিয়েছে। যা তত্ত্বীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র জ্ঞানের জন্যে প্রয়োজন ছিলো, যে নীতির স্বাধীনতার স্বীকৃতি সেক্ষেত্রে প্রয়োজন ছিলো না, নৈতিক জীবনের আলোচনাকালে তাকেই স্বাধীন বলে স্বীকার করতে তিনি বাধ্য হয়েছেন।

কান্টের ত্রুটি প্রকৃতপক্ষে তাঁর এ অস্বীকৃতিতে নয়। তাঁর মৌলিক ত্রুটি রয়েছে মানব-জ্ঞানের ক্ষেত্রকে ভাগ করার মধ্যে। মানব-মানস এক এবং অবিভাজ্য বলে একদিকের কার্যকারিতার প্রতিক্রিয়া অপরদিকে দেখা দেয়। জ্ঞানের ক্ষেত্রকে নীতির ক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে তার বিশ্লেষণ করলে এবম্বিধ ত্রুটি তাতে দেখা দেয়া খুবই স্বাভাবিক। মানব-জীবনে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠার নীতি (principle) একদিকে যেমন জ্ঞানের পক্ষে অপরিহার্য, তেমনি জীবনের পক্ষেও মূল্যমানস্বরূপ। তত্ত্বীয় জ্ঞানের দিক থেকে স্থান-কালকে আমরা স্বজ্ঞার আকার (Forms of Intuition) বলে ধারণা করতে পারি, তবে নৈতিকতার রাজ্যে এগুলোর মূল্যমান হিসেবেও দাম রয়েছে। যে-কোনো নীতিসংক্রান্ত কাজ সম্পাদন করতে হলে স্থান-কালে অবস্থিত কোনো উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে স্বীকার করতে হবে। স্থান-কালের ধারণা ব্যতীত কোনো উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা অবহিত হতে পারি নে। এজন্যে নৈতিক জগতেও তাদের মূল্য রয়েছে। তেমনি যে তুরীয় ঐক্য-নীতির কার্যকারিতার স্বাধীনতার স্বীকৃতি ব্যতীত আমরা জ্ঞানের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে ঐক্যের অপর কোনো সূত্রের সন্ধান পাইনে, তেমনি নৈতিক জ্ঞানের বিভিন্ন পর্যায়েও এক ঐক্য-নীতির স্বাধীনতার

স্বীকৃতি ব্যতীত আমরা নৈতিক জীবনের নানাবিধ অভিজ্ঞতার মধ্যে সামঞ্জস্যের সূত্র আবিষ্কার করতে পারি নে। সোজা কথায় আত্মজ্ঞানের মূলনীতি উভয় ক্ষেত্রেই রয়েছে ক্রিয়াশীল, এজন্যে তত্ত্বীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন, নৈতিক জ্ঞানের ক্ষেত্রেও তেমনি আত্মজ্ঞানের স্বাধীনতা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। গোড়াতে তাকে স্বীকার করে নিলে কান্টের পক্ষে ইচ্ছার স্বাধীনতাকে নৈতিক জীবনের স্বতঃসিদ্ধ বলে গ্রহণ করার কোনো প্রয়োজনীয়তা ছিলো না। তিনি তত্ত্বীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে যাকে পরোক্ষে স্বীকার করেছেন, তাকে প্রত্যক্ষে স্বীকার করলে তার পক্ষে নৈতিক জীবনে ইচ্ছার স্বাধীনতাকে পুনরায় স্বীকার করতে হতো না।

এ আলোচনাতে স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে, নৈতিক জীবনে ইচ্ছার স্বাধীনতাকে স্বীকার না করলে নৈতিক জীবনের বিচারের কোনো মূল্য থাকে না। এ স্বাধীনতার নীতি তত্ত্বীয় জীবনেও অবশ্য স্বীকার্য। তাহলে বাস্তবজীবনে সে নীতি কিভাবে দেখা দেয় এবং তার ফলিত রূপ কি সে সম্বন্ধেও আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে।

স্বাধীনতার স্বরূপ নীতিগতভাবে ও বাস্তব জীবনে

স্বাধীনতা বলতে সাধারণত নির্ভরতা বুঝা যায়। কারো উপর নির্ভর না করে যখন কোনো মানুষ তার নিজের শক্তির উপর নির্ভর করে— তার জীবনের সব কিছুর ব্যবস্থা করতে পারে— তখন তাকে বলা হয় স্বাধীন। তেমনি বনের পশু পাখি অন্য কোনো জীবের মুখাপেক্ষী নয় বলে, তাদেরও বলা হয় স্বাধীন। তবে স্বাধীনতা পদটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় বলে তার মধ্যে রয়েছে নানাবিধ দিক। ইচ্ছার স্বাধীনতা, কর্মের স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, ধর্মের স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা— সকল প্রকারের স্বাধীনতাই এ পদবীর অন্তর্ভুক্ত। একই মানব-জীবন এদের এগুলোর পটভূমিতে বর্তমান বলে তারাও আবার পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। এজন্যে দেখা যায়— কোনো একটা বিশেষ দিকের স্বাধীনতার জন্যে কোনো আন্দোলনের সৃষ্টি হলে—তার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া অপরদিকে দেখা দেয়। চিন্তার স্বাধীনতার জন্যে কোনো আন্দোলন দেখা দিলে, কালে তার ফলে রাজনৈতিক আন্দোলনও দেখা দেয়। এ পৃথিবীর ইতিহাসে তার জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত বর্তমান।

পঞ্চদশ শতকে প্রথমত ইতালীতে এবং সমগ্র ইউরোপে যে রেনেসাঁ আন্দোলন দেখা দেয়, তার মূলমন্ত্র ছিলো চিন্তার রাজ্যে ব্যষ্টি-জীবনের স্বাধীনতা। রোমানদের কর্তৃক খ্রীষ্টধর্ম রাজকীয় ধর্মরূপে গৃহীত হওয়ার পর, ধর্মযাজক লোপ, ধর্মীয় চিন্তার রাজ্যে মানব-জীবনের যে সীমারেখা টেনে দিয়েছিলেন, তার ভীষণ প্রতিক্রিয়া রূপেই দেখা দিয়েছিলো – এ রেনেসাঁ আন্দোলন। এ আন্দোলনের অনুপ্রেরণার মূলে ছিলো প্রাচীনকালের গ্রীকদের অবদান। রোমান সাম্রাজ্যের বিভাগের ফলে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্সটান্টিনোপলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় গ্রীকদের পাণ্ডিত্যের চর্চার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। কন্সটান্টিনোপলকে কেন্দ্র করে গ্রীকদের নানাবিধ অবদানের ভাষ্যকারগণ এখানে সম্মিলিত হন। উসমানী-তুর্কীরা কন্সটান্টি-নোপল অধিকার করার পর এ সব পণ্ডিত ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। তার ফলে গ্রীক সংস্কৃতির নানাবিধ অবদানও ইউরোপের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ইউরোপবাসী বিস্মিত হয়ে দেখতে পায়, খ্রীষ্টপূর্ব যুগে স্বাধীন-মানবের অধিকারী গ্রীক মনীষাগণ তাঁদের স্বকীয় চিন্তার ফলে যে অবদানে এ বিশ্বসংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছেন, তার তুলনায় খ্রীষ্টধর্মের অবদান নিতান্ত অকিঞ্চিৎ। অতএব ব্যষ্টি-জীবনে আবার স্বাধীনতার নীতি গ্রহণ করে— ব্যক্তিকে তার নিজস্ব ধারায় চিন্তা করার স্বাধীনতা দিতে হবে।

এ নীতিকে মূলমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করার ফলেই— ইংল্যাণ্ডের শেক্সপীয়র, স্পেনের সাভেনটীস, হল্যাণ্ডের ইর্যাসমাস, ফ্রান্সের

রেবেলা প্রমুখ মহান স্রষ্টাদের উদ্ভব সম্ভব হয়। এঁরা মানসিকতার দিক থেকে ছিলেন গ্রীকদের ভাবাপন্ন। কোনো পূর্বনির্দিষ্ট সূত্র বা মন্ত্র দ্বারা প্রভাবান্বিত না হয়ে, ওরা তাঁদের স্বেচ্ছায় বরিত পূর্বসূরীদের মতো আপনাদের স্বকীয় জ্ঞানের আলোকে এ জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রকাশ করেছিলেন।

তাঁদের এ বিদ্রোহ কেবল চিন্তার ক্ষেত্রে বা তাঁদের সৃজনমূলক প্রতিভার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে নি। তাঁদের এ বিদ্রোহের পরিণতিতে ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রেও বিদ্রোহ দেখা দেয়। দীর্ঘকাল পোপের শাসন ও অনুশাসনের নানাবিধ আদেশ ও নির্দেশে অসহ্যভাবে ক্লিষ্ট হয়ে ইউ-রোপীয় মানস তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, ষোড়শ শতাব্দীতে মার্টিন লুথার এর মাধ্যমে প্রটেস্টান্ট ধর্ম প্রচার করে। এ নতুন ধর্মের মাধ্যমে ধর্মের রাজ্যে ব্যষ্টি-জীবনের চিন্তায় স্বাধীনতা ছিলো সর্বপ্রধান বক্তব্য।

তবে এ বিদ্রোহের স্রোত এখানে এসেও স্তব্ধ হয় নি। এ চিন্তার এবং এ বিদ্রোহের ব্যাপ্তির ফলে অষ্টাদশ শতকে ফরাসী দেশে রাষ্ট্র-বিপ্লব দেখা দেয়, এবং ইউরোপের বুকে প্রজাতন্ত্রের নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বিপ্লবের মন্ত্র ছিলো—সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধী-নতা। তাতে একথাই প্রমাণিত হয়—মানব-মানস এবং অভিজ্ঞ-তার গতি একদিকে ক্রিয়াশীল হলে তার প্রতিক্রিয়া সকল দিকে দেখা দেয়।

এক্ষেত্রে আমাদের বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, ব্যক্তিগত জীবনে, ধর্মীয় জীবনে এবং রাজনৈতিক জীবনে স্বাধীনতার অর্থ কি? সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে—এ স্বাধীনতা বাস্তবজীবনে কিভাবে ফলিত রূপ নেয়।

যে ব্যষ্টি-জীবনের চিন্তার স্বাধীনতার জন্যে রেনেসাঁর মনীষীগণ পূর্বতন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, তার মধ্যেও রয়েছে নানাবিধ দিক। ব্যষ্টি-জীবনে চিন্তার স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে ব্যষ্টিকে তার যথা-ইচ্ছা যে-কোনোভাবে চিন্তা করার স্বাধীনতা দিতে হবে। ব্যষ্টির পক্ষে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা রয়েছে কিনা. এক্ষেত্রে তা অবান্তর। কেননা এক্ষেত্রে পূর্বস্বীকৃতি হিসেবে পূর্বেই গৃহীত হয়েছে, ব্যষ্টির যে ক্ষমতা রয়েছে যদি এ ক্ষেত্রে দর্শনশাস্ত্রের যে অতি পুরনো ইচ্ছার স্বাধীনতার তর্কও মুলতুবি রাখা যায়, তাহলেও একটা বিষয় আমাদের বাধ্য হয়ে আলোচনা করতে হয়—সে স্বাধীন মানুষের কার্যকারিতার সময়—আমাদের পক্ষে কি কোনো স্বতঃসিদ্ধ নীতি গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা থাকে না, এ কার্যকারণ-নীতি, প্রকৃতির সমরূপতা প্রভৃতি তর্কশাস্ত্রসঙ্গত নানাবিধ নীতিকে অস্বীকার করে কি আমরা কোনো স্বাধীন মানসের কার্য-কারিতায় প্রত্যয়শীল হতে পারি? কোনোও কারণ ব্যতীত কোনো কার্যই দেখা দিতে পারে না, এ বিশ্বের ও মানস-রাজ্যের অবিসংবাদিত নীতি। তার উপর বিশ্বের সর্বত্রই সমরূপিতা নামক নীতি কার্যকরী রয়েছে। যে বস্তুতে যেসব গুণ রয়েছে অথবা এ বিশ্বে যেসব নীতি

কার্যকরী রয়েছে, তারা কোনো অবস্থায়ই পরিবর্তনশীল নয়, এ স্বতঃ-সিদ্ধকে অস্বীকার করে আমরা ব্যক্তি-স্বাধীনতার নীতিকে বাস্তব জীবনে কার্যকরী করতে পারি নে। তার উপর আমাদের সব সময়েই অপর একটা স্বপ্রমাণ নীতিতে বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়। সেটা হচ্ছে: এ বিশ্বে রয়েছে এমন একটা বিধান— যার প্রতিষ্ঠার ফলে কালের ক্ষেত্রে মানুষ কোনোভাবেই প্রতারিত হচ্ছে না। সত্যিকার জ্ঞানলাভের অনুসন্ধিৎসার ফল কোনো কালেই ব্যর্থ হয় না। এক্ষেত্রে প্রবঞ্চনা বা প্রতারণার কোনো সুযোগ নেই। ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রেক্ষা-পটে তাই কতকগুলো স্ব-প্রমাণ নীতির স্বীকৃতি রয়েছে। আবার এ ব্যক্তিস্বাধীনতাকে স্বীকার করে চিন্তার ক্ষেত্রে তার ক্রিয়াশীলতাকে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে গ্রহণ করলে, মানব-মানসের পক্ষে স্বাধীনভাবে এ বিশ্ব সম্বন্ধে তার দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠার সুযোগ হয়। রেনেসাঁতে যে স্বাধীনতার নীতি স্বীকৃত হয়েছিলো তার ফলেই আধুনিক দর্শনের জন্ম। বেকনের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার যে প্রয়াস দেখা দেয়, তারই পরিণতিতে একদিকে অভিজ্ঞতাবাদ বিকাশলাভ করে। অপরদিকে ডেকার্তের সংশয়বাদ থেকেই যুক্তিবাদ বিকাশলাভ করে। এসব মতবাদের পটভমিতে যে নীতির স্বীকৃতি রয়েছে, তা ব্যষ্টি-জীবনের স্বাধীনতার প্রসঙ্গেই আলোচনার যোগ্য। এক্ষেত্রেও কতকগুলো স্ব-প্রমাণ নীতির স্বীকৃতি অবশ্য গ্রহণীয় হয়ে পড়ে। অভিজ্ঞতাকে মানব-জীবনের চরম জ্ঞানের মাধ্যম বলেই স্বীকার করা হোক অথবা যুক্তিকেই চরম পন্থা বলে গ্রহণ করা হোক না কেন, উভয় ক্ষেত্রেই মানব-চিন্তার সঙ্গে এ

বিশ্বের জ্ঞাত বিষয়ের ঐক্য, যাকে গ্রীকতত্ত্ববিদ পারমেনাইডিস বলেছিলেন, Identity of thought and being —অর্থাৎ চিন্তার ও চিন্তার বিষয়বস্তুর ঐক্য স্বীকার করে নিতে হয়। এ নীতিকেই পরবর্তীকালে জার্মান দার্শনিক শেলিং গ্রহণ করে তাঁর মতবাদের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অতি আধুনিক দর্শনে যৌক্তিক বাস্তবতাবাদ বা Logical positivism জ্ঞানের একমাত্র ভিত্তি হিসেবে সংবেদনকে গ্রহণ করে অপরাপর মতবাদের ভ্রান্তি প্রদর্শনে সচেষ্ট হয়েছে সত্যি, তবে এ মতবাদের মধ্যে এ স্বীকৃতি উহ্য রয়েছে। এতে স্বীকার করা হয়েছে— এ বিশ্বে এমন এক বিধান রয়েছে, যার ফলে আমাদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা যে সংবেদন লাভ করি তাতে বিশ্বের কোনো না কোনো বিষয়ের প্রকৃত রূপ প্রতিভাত হয়। কাজেই জ্ঞানের ক্ষেত্রে এ নীতির স্বীকৃতি ব্যতীত কিছুতেই অগ্রসর হওয়ার কোনো উপায় নেই।

স্বাধীনতার এ নীতি ধর্মের ক্ষেত্রে স্বীকার করার ফলে ব্যষ্টিযাজক-দের কবল থেকে মুক্তি পায়। যাজকেরা একদিকে গডের এবং অপর-দিকে ভক্তের মধ্যবর্তী হিসেবে বিরাজ করতেন। ভক্তের পক্ষে সরাসরি গডের কাছে কোনো আবেদন-নিবেদন করার অধিকার ছিলো না। এজন্য তা করতে হতো যাজক শ্রেণীর মাধ্যমে। ধর্মের ক্ষেত্রে স্বাধী-নতা লাভের ফলে সাধারণ মানুষের পক্ষে খোদ গডের কাছে নানাবিধ প্রার্থনা করার সুযোগ লাভ হয়। তার ফলেই প্রটেস্টানন্ট ধর্মের উৎপত্তি হয়। তার প্রধান নীতি ছিলো, ধর্মের রাজ্যে ব্যক্তিস্বাধীনতার

নীতিকে অবশ্য গ্রহণীয় বলে গণ্য করতে হবে এবং ব্যক্তি তার আবেদন-নিবেদনের জন্য আর যাজক-শ্রেণীর দ্বারস্থ হবে না।

আপাতদৃষ্টিতে ধর্মের রাজ্যে তাই স্বাধীনতার অর্থ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এক্ষেত্রে স্বাধীনতার অর্থ যথা ইচ্ছা তথা মতবাদের প্রচারণা বর্জন নয়। একে সংস্কারের স্বাধীনতা বলা যেতে পারে। তবে এ-ও বাহ্য। ধর্মের গোড়াতেও রয়েছে স্বাধীন চিন্তা। প্রতিটি ধর্মের ইতিহাস পাঠ করলেই দেখা যায়—ধর্ম প্রবর্তকগণ তাঁদের সমসাময়িক কালে ছিলেন সংশয়বাদী, তাঁরা তাঁদের তৎকালীন সমাজে প্রচলিত ধর্ম-মতকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে পারতেন না বলে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তৎকালীন রাজ-পূজাতে কোনো আস্থা স্থাপন করতে না পেরে এবং নমরূদকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলে পূজার অর্থ দান করতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। এজন্যেই তাকে অস্বীকার করে তিনি স্বকীয় দ্বন্দ্বমূলক ন্যায়শাস্ত্রের (Dialectic) মাধ্যমে এক সর্বশক্তিমান সার্বভৌম আল্লাহর ধারণা করেছিলেন। তেমনি তাঁর পরবর্তীকালে হযরত মুসা (আঃ) মিসরের তৎকালীন শাসনকর্তা ফেরাউনকে আল্লাহ বলে স্বীকার করতে না পেরে----তার সঙ্গে আযৌবন সংগ্রাম করে অবশেষে বনি-ঈসরাইলদের নিয়ে নীলনদী পার হয়ে আরব ভূখণ্ডে বসতি স্থাপন করেছিলেন। হযরত ঈসা নবীই (আঃ) তেমনি এক ভয়ঙ্কর হিংসাপরায়ণ আল্লাহর ধারণা গ্রহণ করতে অসম্মত হয়ে নানাবিধ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন। তেমনি হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)

তৎকালীন কোরেশ সমাজ-পূজিত তিনশ ষাটটি প্রতিমার পূজাকে জীবনের প্রধান ব্রত বলে গ্রহণ করতে অসম্মত হয়ে, অবশেষে তাদের চক্ষুশূল হয়ে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, ধর্মীয় জীবনের গোড়াতেই রয়েছে ধর্ম-প্রবর্তকদের বিদ্রোহ এবং সে বিদ্রোহের ফলেই অভিনব ধর্ম জন্মলাভ করে। এতে আরো প্রমাণিত হয়—যেহেতু ধর্মপ্রবর্তকদের পক্ষে এ স্বাধীনতার নীতি স্বীকৃতি ব্যতীত নতুন ধর্মের উৎপত্তি সম্ভবপর ছিলো না, সেজন্যে তাদের জীবনেও ব্যক্তিস্বাধীনতার নীতি স্বীকৃতিলাভ করেছে এবং ব্যক্তিজীবনে যেসব নীতি গ্রহণীয় বলে স্বীকৃতিলাভ করেছে—তাদের জীবনেও সেগুলো স্বীকৃতি লাভ করেছিলো। তবে ব্যষ্টি-জীবনের স্বাধীনতা ও ধর্মীয় জীবনের স্বাধীনতার মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্যও অনস্বীকার্য। ব্যক্তিজীবনে স্বাধীনতা পুনঃ পুনঃ দেখা দেওয়ার রয়েছে সমূহ সম্ভাবনা। ধর্মীয় জীবনে সে-স্বাধীনতা এত সহজ নয়। দীর্ঘকাল একটি ধর্মের আধিপত্যের মধ্যে মানুষ বাস করে তাকে এক স্বাভাবিক ব্যবস্থা বলেই গ্রহণ করে। তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হলে যে সাহস, ধৈর্য ও আন্তরিকতার প্রয়োজন—তা যুগে যুগে একান্তভাবেই দুর্লভ হয়ে পড়ে। কাজেই ধর্মের রাজ্যে স্বাধীনতার অর্থ ধর্মের মূল কাঠামোর মধ্যে অবস্থান করেও তার অন্তর্গত নানাবিধ নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

এজন্যেই দেখা যায়, রেনেসাঁতে ব্যষ্টি-জীবনের স্বাধীনতার জন্যে যে আন্দোলন দেখা দেয়, পরবর্তীকালে তা খ্রীষ্টধর্মের সম্পূর্ণ

অস্বীকৃতিতে পর্যবসিত হয় নি। তা খ্রীষ্টধর্মের অন্তর্গত নীতির সংস্কারে ছিলো তৎপর। তার ফলেই প্রটেস্টানট ধর্মের উৎপত্তি।

রাজনৈতিক জীবনে স্বাধীনতার অর্থ--ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রনীতিতে ব্যষ্টির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ। কারণ ব্যক্তিগত জীবনে মানুষের স্বাধীনতা না থাকলে সমাজ বা রাষ্ট্রীয় জীবনে তার স্বাধীনতা থাকা সম্ভবপর নয়। ব্যক্তিগত জীবনে চিন্তার যে স্বাধীনতা মানুষের মৌলিক অধিকার বলে স্বীকৃত, তাকে ফলিত রূপ দিতে হলে সামাজিক জীবনেও তার স্বাধীনতাকে স্বীকার করতে হবে। সামাজিক জীবনের স্বাধীনতার অর্থ রাষ্ট্রীয় জীবনেও স্বাধীনতার স্বীকৃতি। কারণ রাষ্ট্র হচ্ছে সমাজেরই সার্বভৌমত্ব প্রাপ্তরূপ। তবে রাষ্ট্রীয় জীবনের এ স্বাধীনতার অর্থ নিয়ে নানা বাকবিতণ্ডার উৎপত্তি হয়েছে। রাষ্ট্রীয় জীবনে এ স্বাধীনতার কতকগুলো বিকল্প রয়েছে। একে একে এগুলোর বিশ্লেষণ করা যাক। প্রথমত এমন কোনো রাষ্ট্র থাকতে পারে যেখানে ব্যষ্টিজগৎ ও জীবন সম্বন্ধে নানাবিধ মতবাদ গঠন অথবা পোষণ করতে পারে, তবে এসব মতবাদের সঙ্গে সমাজের, রাষ্ট্রের বা গণমানুষের কোনো যোগ নেই। এগুলো তথাকথিত পণ্ডিত মহলেই থাকে সীমাবদ্ধ। এ উপমহাদেশের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, চিন্তাধারার ক্ষেত্রে এদেশীয় মনীষীরা যে অপূর্ব প্রতিভার নিদর্শন দেখিয়েছেন তা অনবদ্য। তবে সেসব চিন্তার ফল রাষ্ট্রীয় জীবনে কোনো বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে নি। মহানাস্তিক চার্বাক থেকে আরম্ভ করে শঙ্করাচার্য পর্যন্ত

সব তত্ত্বজ্ঞানীকে ভারত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে ঋষি বা দ্রষ্টা বলে আখ্যায়িত করেছে। এদেশে কোনো প্রত্যাদেশমূলক ধর্ম প্রচারিত হয় নি বলে ধর্মের ক্ষেত্রে বা চিন্তার ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা ছিলো পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। তবে এসব মুনিদের বাণীকে সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় রূপ দেওয়ার জন্যে কোনো সাধনা দেখা দেয় নি। এঁদের অমূল্য বাণী প্রচারের ফলে নানাবিধ দল, উপদল বা সংঘ ইত্যাদি গড়ে উঠেছে সত্যি, তবে কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে নি। খ্রীষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মহাজ্ঞানী বুদ্ধদেব যে-মতবাদ প্রচার করেছিলেন, তারই ফলে বৌদ্ধসংঘ বা বৌদ্ধবিহার গড়ে উঠেছে। তবে বৌদ্ধধর্ম-নীতির কাঠামোতে কোনো রাষ্ট্র গঠিত হয় নি। তেমনি খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য কর্তৃক উপনিষদের ব্রহ্মবাদের ভাষ্য দানকালে যে মতবাদ বা সর্বেশ্বরবাদ প্রচারিত হয়েছিলো, তার ফলে দশনাম সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়েছে সত্যি, তবে কোনো রাষ্ট্রনীতির প্রবর্তন হয় নি। তাতে এ সত্যই প্রমাণিত হয়, কোনো কোনো রাষ্ট্রে ব্যষ্টির স্বাধীনতা বলতে এমন এক অবস্থা বুঝায় যাতে ব্যষ্টি যেভাবেই তার ইচ্ছা হোক না কেন, চিন্তা করতে পারে তবে সে চিন্তার দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি প্রভাবান্বিত হবে না। এগুলোর কোনো সাক্ষাৎ ফলিত রূপ নেই।

এ উপমহাদেশেই ব্যক্তিগত জীবনের এ স্বাধীনতার নীতি দীর্ঘ-কাল পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছিলো। পাঠান বা মোগলদের দ্বারা এদেশ বিজিত হলেও, বিজেতা শাসকেরা এ দেশীয় ধর্মে বা দার্শনিক

মতবাদে হস্তক্ষেপ করেন নি। তার ফলে বিজিত লোকেরা যেমন স্বধর্ম পালন করতে কোনো প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় নি, তেমনি ধর্ম সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে চিন্তা করারও অবকাশ পেয়েছে। রামানন্দ, কবীর, নানক ও চৈতন্য—পাঠান আমলে তাঁদের নিজস্ব ধর্মমত প্রচার করেছেন।

অপরদিকে বিজয়ী মুসলিম শাসকেরা জেহাদের নামে মুসলিম-মানসে উত্তেজনার সৃষ্টি করে এদেশ জয় করেছেন; অথচ জয় করার পরে তাঁরা এদেশে ইসলামী শাসন তো নয়ই, ইসলাম-বিরোধী শাসন প্রবর্তন করেছেন। তাতে মনে হয়, মধ্যযুগে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অর্থ ছিলো—অপর কোনো রাজার অধীনতা থেকে মুক্ত কোনো দেশের সাধারণ অবস্থা। তাতে সেদেশের মানুষের ধর্মীয় বা দার্শনিক মতবাদ প্রচার করার বা গ্রহণ করার স্বাধীনতা থাকতে পারে, তবে সে-স্বাধীনতাপ্রসূত মতবাদের রাষ্ট্রীয় রূপ দেবার কোনো স্বাধীনতা নেই; অথচ বর্তমানকালে রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে, সর্বপ্রকার শোষণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি। আবার এ মুক্তিকে সম্পূর্ণভাবে রূপায়িত করতে হলে দেশের সব মানুষকে একই দার্শনিক মতবাদে দীক্ষা দেওয়া হয় অবশ্য প্রয়োজনীয়। উদাহরণ-স্থলে বলা যায়, বর্তমান কালে সোভিয়েট রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় বিধানের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, সেদেশে শোষণের কোনো সুযোগ নেই। তবে সে দেশবাসী প্রতিজন নরনারীকে মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদে প্রত্যয়শীল হতে হবে। অপরাপর যেসব দেশে পূর্ণমাত্রায় স্বাধীনতা

রয়েছে বলে দাবি করা হয়, তাতে চিন্তারও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নেই, এবং তাতে সে দেশের বাসিন্দা এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীর শোষণের রয়েছে সম্পূর্ণ সুযোগ ও সুবিধা।

এ ক্ষেত্রে স্পষ্টই প্রমাণিত হচ্ছে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা-বিহীন চিন্তার স্বাধীনতা বা চিন্তার স্বাধীনতা-বিহীন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কোনোটাই সম্পূর্ণ সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা নয়। সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা হচ্ছে চিন্তার স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থাৎ শোষণ-বিহীন সমাজব্যবস্থা। বর্তমান দুনিয়ায় তা কোথাও নেই।

তবে এক্ষেত্রে বিশেষ বিচার্য বিষয়, এই স্বাধীনতার এবম্বিধ সংজ্ঞা হঠাৎ এ বিশ্বে দেখা দেয় নি। যুগ-যুগান্তরের নানাবিধ ধ্যান-ধারণা ও গবেষণার ফলে মানব-মানসে মানবোচিত কতকগুলো মূল্যমান দেখা দিয়েছে এবং এগুলোর আবেগেই মানুষ তার জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রকে কোথাও সংস্কার করেছে। আবার কোথাও বৈপ্লবিক চেতনার আলোকে প্রবর্তন করে সমাজ-সংস্থাকে ধূলিসাৎ করে নতুন সমাজের ইমারত গড়ে তুলেছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, এ মূল্যমানগুলোর উৎপত্তি হয় কোথা থেকে? কোনো কোনো মহলের ধারণা—এগুলোর উৎপত্তিতে রয়েছে একমাত্র অর্থনৈতিক কারণ। তবে তাতেও রয়েছে গলদ। কারণ অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সে যে বিপ্লব দেখা দেয় তার মূলে ছিলো সামন্তপ্রথার

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। যুগ-যুগান্তের সামন্ত-সর্দারদের শোষণ থেকে অব্যাহতি লাভের প্রচণ্ড উৎসাহে ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের অধিনায়কেরা তাদের রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করে, তার স্থলে সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতার মূলে মৌলিক নীতিতে তাকে আবার পুনর্গঠন করেন। আবার বিংশ শতাব্দীতে সেই একই সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে জার-শাসিত রাশিয়ার লোকেরা সমাজতন্ত্র-বাদের আদর্শে রাষ্ট্র গঠন করেন। এদের মূলনীতি ছিলো (রাষ্ট্রের অধীনস্থ) প্রত্যেক ব্যক্তিই তার সাধ্যানুসারে (রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্যে) পরিশ্রম করবে এবং প্রত্যেকে তার প্রয়োজন অনুসারে তা থেকে উপভোগ করার ক্ষমতা লাভ করবে। (To each according to his capacity and to each according to his needs)। এখানে জিজ্ঞাসার বিষয় হচ্ছে, একই সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেও উভয় দেশের রাজনৈতিক শ্লোগানের মধ্যে এ পার্থক্য দেখা দিলো কেন? তার উত্তর হচ্ছে অষ্টাদশ শতকে অনুষ্ঠিত ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের পরিস্থিতি থেকে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে অনুষ্ঠিত রুশ দেশীয় রাষ্ট্রবিপ্লবের পরিবেশের ছিলো আকাশপাতাল পার্থক্য। কারণ, এ দুশো বৎসরে রাজনৈতিক চেতনায় নানাবিধ অভিনব মূল্যমানের উৎপত্তি হয়েছে। সেসব মূল্যমানের মধ্যে অর্থনৈতিক মান হচ্ছে সর্বপ্রধান। তাই ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের শ্লোগান ছিলো সামাজিক সাম্য (equality), ভ্রাতৃত্ববোধ (fraternity) ও চিন্তার স্বাধীনতা (liberty)। রাশিয়ার বিপ্লবে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সাম্যের উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাহলে একথাই প্রমাণিত

হচ্ছে, পরিস্থিতির মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও জীবনের মূল্যমানের আলোকেই তার বিচার হয়—এবং যে মূল্যমানের উৎপত্তি অর্থনৈতিক পরিস্থিতি থেকে হয় না, তাদের উৎপত্তি হয় আরো নানাবিধ কারণ থেকে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে ব্যক্তিগত জীবনের স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে রয়েছে কতকগুলো মৌলিক নীতির স্বীকৃতি। ধর্মীয় জীবন ও ব্যক্তি-জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে বলে তাতেও কতকগুলো মৌলিক নীতি অবশ্য গ্রহণীয় এবং সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জীবনে এগুলো তো অবশ্যই গ্রহণীয়; তার উপর আরো কতকগুলো মূল্যমানের ও স্বীকৃতির প্রয়োজন। এগুলোর মধ্যে আবার পারস্পরিক দ্বন্দ্ব নেই। কার্যকারণ পরম্পরা-নীতির সঙ্গে এ জগতের সমতার নীতির কোনো বিরোধ নেই। এ জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা বা মানুষের বাসনা চরিতার্থ হওয়ার পক্ষে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই—নানর্ক নীতির স্বীকৃতির সঙ্গে পূর্বোল্লেখিত নীতিদ্বয়ের স্বীকৃতির কোন বিরোধ নেই। আবার এসব নীতির স্বীকৃতির সঙ্গে এ জগৎ এমন এক স্থিতি যাতে সর্বযুগেই নানাবিধ মূল্যমানের উদয় ও অস্ত হচ্ছে এবং তাদের উৎপত্তিতে মানব-সমাজের নানাদিক প্রভাবান্বিত হচ্ছে। এরূপ প্রত্যয়ের কোনো বিরোধ নেই। আবার বিভিন্ন নীতির মধ্যে কোনো সংঘর্ষ বা সংঘাত দেখা দিচ্ছে না। তাহলে এ বিশ্বের প্রেক্ষাপটে কেবল অন্ধ জড়পদার্থের খেলায় বিরাজমান? না তাতে এক এক পরম সংহতি ও বিন্যাস বর্তমান? এরূপ বিকল্প

আমাদের সামনে স্বভাবতই উত্থাপিত হওয়া স্বাভাবিক। যদি ভাবা হয় যে, এ বিশাল ভূমণ্ডলের মধ্যে সংযম, শৃঙ্খলা ও বিন্যাসের মূলে এমন এক স্থিতি বর্তমান যার স্বাভাবিক ধর্মই হচ্ছে উপরোক্ত নীতি বা গুণাবলীর প্রকাশ, তাহলে ব্যক্তিগত, সমাজগত বা রাষ্ট্রগত জীবনে স্বাধীনতার দাবি প্রতিহত হবে—না অগ্রগতি লাভ করবে—তা-ই বিচার্য বিষয়।

গ্রন্থপঞ্জি

১. এম. এন. রায়, **'দর্শন ও বিপ্লব'**, পৃঃ ২৮-২৯।

২. Huston Smith, **'The Religion of Men'**, New York, U.S.A. p 199,

৩. Ibid. p 99.

৪. Bertrand Russell, **'Religion and Science'**, 1935.

৫. Huston Smith, **'The Religion of Men'**.

৬. Ibid, p 305.

৭. Ibid, p 505.

৮. Abul Hashim, **'The Creed of Islam'**, Dhaka.
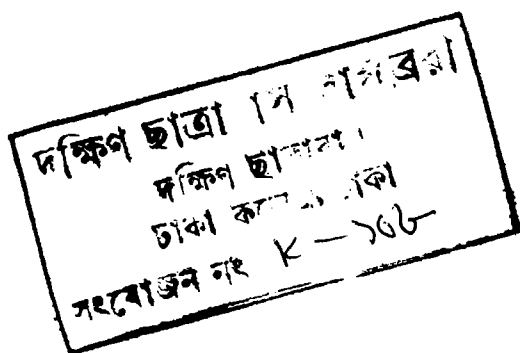
এ গ্রন্থমালার বই সবার জন্যে।

পৃথিবী নিয়ে, জীবন নিয়ে ভাবনা মানুষের বহু দিনের। দেখা দিয়েছে নানা ধর্ম। উদ্ভূত হয়েছে নানা দর্শন। ধর্মের সঙ্গে দর্শনের সম্পর্ক নিয়ে এ বই।